গীতায় সমাজদর্শন

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী

শ্রীশ্রীঅক্ষয় ধর্ম মহাসভা

প্রথম প্রকাশ : জন্মাষ্টমী, শ্রাবণ, ১৩৫৭
আগস্ট, ১৯৫০

প্রচ্ছদপট : শ্রীসুধীন কুমার ভট্টাচার্য
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন-আশ্রম
পোঃ নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা

প্রকাশক : শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র দে
শ্রীশ্রীঅক্ষয় ধর্ম মহাসভা
অবন্তীপুর
পোঃ মণ্ডলপাড়া, ২৪ পরগণা।

মুদ্রাকর : শ্রীবিবেকরঞ্জন দাশ
অনুশীলনী প্রকাশন
২০ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

নিবেদন

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিস্থতা ॥

ভারতের ঋষি বলিয়াছেন—'সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্', 'ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্'; 'কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্'। ঋষির বাণীর তাৎপর্য এই—যদি আমরা ইহলোকে ও পরলোকে যথার্থ কল্যাণ লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের সত্য, ধর্ম, ও কুশলের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইলে চলিবে না। আজ আমরা ভারতের শাশ্বত ও সনাতন আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্ধ পতঙ্গের ন্যায় ভোগরূপ বহ্নিশিখার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি, তাই যিনি ঐশ্বর্যশালী তিনিও আজ অন্তরে রিক্ত,—সর্বহারা। এই সর্বব্যাপী নৈরাশ্য ও অবসাদ হইতে যদি রক্ষা পাইতে হয় তবে পার্থসারথির উদাত্ত আহ্বানে আমাদিগকে কর্ণপাত করিতে এবং ধর্মের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গঠন করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে। এই জন্যই আজ আমাদের জীবনে গীতানুশীলনের প্রয়োজন সর্বাধিক—গীতার ধ্যান ও ধারণাই আমাদিগকে মহতী বিনষ্টির হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে। তাই ভগবান বাসুদেবের আশীর্বাদ শিরোধার্য করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান 'গীতায় সমাজদর্শন' প্রকাশে উদ্‌যোগী হইয়াছে। অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি গ্রন্থকার পরমভাগবত শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রমের (নরেন্দ্রপুর) শিল্পী ভক্ত শ্রীসুধীন কুমার ভট্টাচার্য এবং 'জিজ্ঞাসা প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের' কর্মিবৃন্দকে। এই প্রচেষ্টায় এঁদের অপরিমেয় সাহায্য ও সহানুভূতির ঋণ অপরিশোধ্য। —ইতি, জন্মাষ্টমী, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

শ্রীশ্রীঅক্ষয় ধর্ম মহাসভার পক্ষে
প্রকাশক

উপক্রম

গীতাধ্যায়ী মহাশয়কে আপনারা অনেকেই চেনেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি লোকের মুখে ধরে না। সমগ্র ভগবদ্‌গীতাখানিই যে শুধু তাঁর কণ্ঠস্থ তাই নয়; গীতার ব্যাখ্যানকালে তিনি প্রয়োজনমত শ্রীধর স্বামী, আচার্য শঙ্কর, রামানুজাচার্য, বিশ্বনাথ, বলদেব, মধুসূদন প্রভৃতি আচার্যগণের বহু উক্তি উদ্ধৃত করে থাকেন। শ্রোতারা অবাক হয়ে ভাবেন—অহো, কী অসাধারণ পাণ্ডিত্য, কী অপূর্ব মেধা! কিন্তু এ কথাও সকলেই জানেন;- গীতাধ্যায়ী মহাশয় মুখে সবাইকে অনাসক্ত ভাবে কর্ম করার উপদেশ দিলেও স্বয়ং ঘোর বিষয়াসক্ত। অসুরপ্রকৃতি লোকের মতো অন্যায় ভাবে অর্থসঞ্চয় করতেও তাঁর কোনো আপত্তি নেই। তিনি স্বয়ং যা বিশ্বাস করেন অথচ গৌরবহানির ভয়ে কারো কাছে প্রকাশ করতে পারেন না, তা হচ্ছে—

'যদীচ্ছসি বশীকর্তুং জগদেকেন কর্মণা।
কলৌ প্রযত্নতঃ সেব্যা কল্পলতা প্রতারণা॥'

যদি একটি মাত্র কর্মের দ্বারা জগৎকে বশীভূত করতে চাও, তা হলে এই কলিকালে সর্বপ্রযত্নে প্রতারণারূপ কল্পলতার সেবা করবে।

গীতাধ্যায়ী মহাশয়ের গীতা-ব্যাখ্যানের যাঁরা শ্রোতা, তাঁদের ভেতর একজনকে আমি বিশেষভাবে চিনি। তাঁর নাম অকিঞ্চন দাস। তাঁর ভেতর পাণ্ডিত্য নেই, সুতরাং পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও নেই, কিন্তু তাঁর ভেতর একটি বড়ো সম্পদ আছে, যেটি গীতাধ্যায়ী মহাশয়ের নেই। সেটি হচ্ছে শ্রদ্ধা। পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি গীতার নির্দেশ জীবনে রূপায়িত করার চেষ্টা করেন। তিনি দ্বন্দ্বাতীত হতে পারেন নি বটে কিন্তু তিনি যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট অর্থাৎ অনায়াসে যা লাভ হয় তাতেই পরিতুষ্ট, তিনি কাউকে ঈর্ষা করেন না, তাঁকেও কেউ ঈর্ষা করেন না। যখন তাঁর জীবনে অবসাদ, নৈরাশ্য বা দৌর্বল্য আসে, তখন তিনি শ্রীভগবানের বাণী স্মরণ করেন—'নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ'। শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়ে তিনি সংসারের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করার চেষ্টা করেন। ত্রিসন্ধ্যা তিনি শ্রীভগবানের নাম জপ করেন, আর এই প্রার্থনা করেন,—'হে ঠাকুর, তুমি আমায় শুভবুদ্ধি দাও, আমায় শ্রেয়ের পথে নিয়ে যাও। আমি ধন চাই না, মান চাই না, আমি অকিঞ্চন, কিন্তু আমার একমাত্র আকিঞ্চন এই, তুমি আমায় তোমার দাস করে নাও।

বলুন তো, এ দু'জনের ভেতর কে বেশী বুদ্ধিমান, কে বেশী শ্রদ্ধাভাজন ?

আমাদের শাস্ত্রকার শুধু গ্রন্থপণ্ডিতকে চন্দনভারবাহী গর্দভের সঙ্গে তুলনা করেছেন, 'যথা খরশ্চন্দনবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।' শাস্ত্রকার এ কথাও বলেছেন, শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেও মানুষ মূর্খ হয়, যিনি ক্রিয়াবান অর্থাৎ শাস্ত্রের নির্দেশ যিনি মেনে চলেন, তিনিই যথার্থ বিদ্বান্। 'শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ যস্তু ক্রিয়াবান পুরুষঃ স বিদ্বান্'।

ভগবদ্‌গীতা উপনিষদ্‌সমূহের অমৃত-নির্য্যাস এবং স্বয়ং একখানি উপনিষদ্। গীতার ধ্যানে বলা হয়েছে—জননী ভগবদ্‌গীতা অদ্বৈততত্ত্বরূপ অমৃতবর্ষিণী ও ভববন্ধননাশিনী। ইহা পদ্মনাভের (শ্রীকৃষ্ণের) মুখপদ্ম থেকে বিনিঃসৃতা, তাই ইহা সর্বশাস্ত্রময়ী। গীতা কামধেনু, আবার গীতাই কল্পতরু। যাঁরা অমৃতপথের যাত্রী, গীতা তাঁদের 'পথের আলো', আবার যাঁরা ব্যবহারিক জীবনে অভ্যুদয় ও সিদ্ধিলাভ করতে চান, গীতা তাঁদের পক্ষেও জননীর ন্যায় হিতকারিণী। যাঁরা আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চান, গীতা তাঁদেরও পরম হিতৈষী বান্ধবের মতো শ্রেয়ের পথ নির্দেশ করেন।

প্রাচীন ভারতের আচার্যগণ ও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ অবশ্য গীতাকে জীবন থেকে পৃথক করে দেখেন নি, কিন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই গীতাকে মোক্ষশাস্ত্ররূপে দেখেছেন। প্রাচীন ভারতে বিদ্যা ছিল গুরুমুখী, গুরুশিষ্য-পরম্পরায় এই বিদ্যার ধারা হ'ত প্রবাহিত। তাই প্রাচীন ভারতের আচার্যগণ গুরুদত্ত সাধন-পদ্ধতির অনুসরণ করেই নিজ নিজ অনুভূতির আলোকে গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। এই সকল আচার্যের মধ্যে শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক, বল্লভ, জ্ঞানেশ্বর (জ্ঞানেশ্বরী গীতা), মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ, মধুসূদন, শ্রীধর স্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সব ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে কেউ হচ্ছেন অদ্বৈতবাদী, কেউ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কেউ দ্বৈতবাদী, কেউ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী অর্থাৎ সকলেই এক একটি বিশিষ্ট মতবাদের ধারক ও বাহক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের আলোকে গীতার ব্যাখ্যা করেছেন, এঁদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'। (পরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর 'গীতামাধুরীতে' গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দৃষ্টিকোণ থেকে গীতা সম্পর্কে সারগর্ভ ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।) কিন্তু

এঁরা গীতাকে অধ্যাত্মশাস্ত্র বা মোক্ষশাস্ত্র হিসাবেই গ্রহণ করেছেন, ব্যবহারিক জীবনে বা সমাজ-জীবনে গীতার উপযোগিতা কতখানি, সে প্রশ্ন তাঁদের অন্তরে উদিত হয়নি। আবার ভারতবর্ষে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগেও এমন অনেক মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা গীতাভাষ্য রচনা না করলেও শ্রীভগবানের বাণী থেকে প্রেরণা লাভ করেই সমাজগঠন, জাতিগঠন ও রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠায় আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে শিবাজী-গুরু সমর্থ রামদাস স্বামী (যিনি শিবাজীকে অনাসক্ত কর্মযোগের আদর্শে দীক্ষিত করেছিলেন) এবং শিখ জাতির শেষ গুরু গুরুগোবিন্দ সিংহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যুগ-প্রয়োজনে আধুনিক কালেও বহু গীতাভাষ্য ও গীতানিবন্ধ রচিত হয়েছে এবং নানা মনীষী গীতার ওপর নব-নব আলোকপাত করেছেন। গীতার প্রাচীন ভাষ্যসমূহে যতই পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্রব্যাখ্যান-কৌশলের পরিচয় থাক, উহা যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক মনের সকল সংশয়ের নিরসন করতে পারে না, মহামনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে এ কথার উল্লেখ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে যাঁরা গীতাব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, (যেমন হিতলাল মিশ্র, কেদারনাথ দত্ত, ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী কৃষ্ণানন্দ), তাঁরা সকলেই প্রাচীন ভাষ্যকারগণের অনুগামী, বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে অথচ শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে গীতার বাংলা টীকা প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর এই টীকা অসম্পূর্ণ (প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত) কিন্তু তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্ব' নামে দু'খানি অতুলনীয় গ্রন্থ ভগবদ্গীতার ওপর যথেষ্ট আলোকসম্পাত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা ছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অমানব প্রতিভাবলে কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদের মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় স্থাপন করেছেন। তরুণ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে একদিন একথা শ্রবণ করেছিলেন এবং তিনি পরবর্তীকালে এই ভাবটিকে বিশদ করেন (গীতায় ঈশ্বরবাদ দ্রষ্টব্য।) পরবর্তীকালে যে সকল বরেণ্য পুরুষ গীতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাঁদের ভেতর বাল গঙ্গাধর তিলক, শ্রীঅরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিলক তাঁর 'গীতারহস্য' নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে যুক্তিবাদের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে গীতায় ভগবান কর্মযোগের বা প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্মের আদর্শ স্থাপন করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ

গীতাকে অবলম্বন করে যে দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার নাম 'পুরুষোত্তমবাদ'। গান্ধীজির দৃষ্টিতে গীতায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ রূপক হলেও এই উপনিষদের প্রধান বক্তব্য অনাসক্তিযোগ। আচার্য বিনোবার মতেও গীতার প্রধান শিক্ষা স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে কর্মকে যজ্ঞে পরিণত করা।* (গীতার প্রাচীন ও আধুনিক ভাষ্যকারদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত গীতার ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।)

মহাত্মা গান্ধী ও আচার্য বিনোবা উভয়েরই সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ কখনও ক্রূর কর্মে লিপ্ত হতে পারেন না। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সনাতন ধর্মের শিক্ষার বিরোধী। তথাপি, একথা আমরা স্বীকার করি যে তাঁরা গীতার শিক্ষা বলতে যা বুঝেছেন, তাকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের গীতা-ব্যাখ্যান (গান্ধীজির গীতাভাষ্য ও বিনোবার গীতা-প্রবচন) খুব প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য, কোথাও এতে পাণ্ডিত্যের কচকচি নেই। গীতার তাৎপর্য সম্পর্কে এঁদের মতবাদে যেমন ঐক্য রয়েছে, তেমনি পার্থক্যও রয়েছে।

ভগবদ্‌গীতার শিক্ষা উদার ও সার্বজনীন, শুধু তাই নয়, এতে পরিপূর্ণতার এমন এক আদর্শ স্থাপিত হয়েছে যা অনত্র দুর্লভ। এইজন্যে দেশ-বিদেশের মনীষিগণ গীতার বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

ভগবদ্‌গীতার উদার ও সার্বজনীন বাণী যে সমস্ত পাশ্চাত্ত্য মনীষীকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে, তাঁদের মধ্যে কার্লাইল, এমার্সন, উইলিয়াম ভন্ হাম্‌বোল্‌ট, 'হার্ট্ অব আর্যাবর্তের' রচয়িতা লর্ড রোনাল্ড্‌সে, এস্. ডি. বার্ণেট, অল্ডাস হাক্সলি প্রভৃতির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। মনস্বী কার্লাইল উইলকিন্স-কৃত গীতার অনুবাদ পাঠ করেই এই গ্রন্থ থেকে অধ্যাত্ম-জীবনের পুষ্টিসাধক রস গ্রহণ করেছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নির্দেশে স্যার চার্লস উইলকিন্সই সর্বপ্রথম ইংরেজি ভাষায় গীতার অনুবাদ করেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস লিখিত ভূমিকা-সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।

প্রাচীন কালে, মধ্যযুগে ও আধুনিক কালে বহু গীতাভাষ্য ও গীতানিবন্ধ রচিত হয়েছে, বিভিন্ন আচার্য ও মনীষিগণের দৃষ্টিতে গীতা হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক শাস্ত্র, কিন্তু গীতার বাণীকে আশ্রয় করে যে আমরা সর্বাঙ্গীণ

* কোন কোন বিষয়ে বিনোবাজির ব্যাখ্যান ভারতীয় ভাবধারার অধিকতর অনুগামী। দ্রঃ গীতা-প্রবচন, ১৮শ অধ্যায়।

মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারি এবং আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র রচনা করতে পারি, সে সম্পর্কে কোন বিশদ আলোচনা ইতঃপূর্বে হয় নি। সেই জন্যে আমি অনধিকারী ও অযোগ্য হয়েও 'গীতায় সমাজদর্শনের' আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। সমাজদর্শন বা Social Philosophy হচ্ছে আদর্শনিষ্ঠ বিদ্যা, বস্তুনিষ্ঠ নয়, অর্থাৎ, সমাজের আদর্শ কি হওয়া উচিত, তাই হচ্ছে সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়। আমাদের শক্তির সীমার কথা চিন্তা করে শ্রীভগবান কোথাও আদর্শকে খর্ব করেন নি, কেননা তিনি জানতেন, আমাদের আদর্শ যে পরিমাণে মহৎ হবে, আমরা সেই পরিমাণেই মহত্ত্বলাভের অধিকারী হ'ব। সেই জন্যে শ্রীভগবান আমাদের সামনে নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শ স্থাপন করেছেন। তিনি যে অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা বলেছেন, তা হচ্ছে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। তিনি স্বয়ং লোক-কল্যাণের জন্যে অনলস, অতন্দ্রিত ভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করেছেন এবং আমাদিগকেও লোক-সংগ্রহের জন্যে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবার তিনিই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন—যজ্ঞার্থ অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীতির জন্যে কর্ম করলে সে কর্ম কখনো বন্ধনের কারণ হয় না। এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, মানুষ যদি যথাশক্তি নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করার চেষ্টা করে, তবে মানুষ হয় দেব-মানব আর মানুষের সমাজ হয় দেবমানব-সমাজ।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্মের প্রবক্তা, সেই ধর্মের (নিষ্কাম কর্মযোগের) স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠানও মানুষকে মহাভয় থেকে ত্রাণ করে।

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'।

গী. ২।৪০

আদর্শ সমাজে সকলেই স্বধর্ম-পালনে রত হন। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ'—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির তাৎপর্য অতি গভীর ও সুদূরপ্রসারী। শ্রীকৃষ্ণ পরম সাম্যবাদী হয়েও মানুষে-মানুষে নৈসর্গিক ভেদ স্বীকার করেছেন। প্রাচীনকালে গ্রীসদেশে মনস্বী প্লেটো আর একালে ব্রাড্‌লে প্রমুখ দার্শনিকগণ ইয়ুঙ্‌ প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ এবং প্রায় সকল শিক্ষাবিজ্ঞানী এই স্বাভাবিক পার্থক্যকে স্বীকৃতি দান করেছেন। বরদাচরণ সেনকৃত 'গীতাসারের' ভূমিকায় পরলোকগত দার্শনিক পণ্ডিত হরিদাস ভট্টাচার্য লিখেছেন—

'যাহার যাহা স্বধর্ম, সে যদি তাহা ত্যাগ করিয়া পরধর্মের অনুষ্ঠান করিতে যায়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি পরাহত হয়। ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি অর্জুন যদি অধর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করিয়া ধ্যানে বসিয়া যান, তাহা হইলে জগতেরও উপকার হইবে না, তাঁহারও মন বসিবে না। বর্ণ ও আশ্রমভেদে কর্তব্যের পার্থক্য হয় এবং বিভিন্ন আধ্যাত্মিক স্তরে বিভিন্ন সোপান অবলম্বন করিতে হয়'। ভূমিকার অন্যত্র তিনি বলেছেন—

'জীবন-সংগ্রামে অবসন্ন যোদ্ধা আমরা সকলেই—অর্জুন আমাদের প্রতীক মাত্র। কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধ সকলকেই করিতে হইবে—যুদ্ধে জয় আত্মপ্রসারের জন্য নয়, আত্মোন্নতির জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য, ভগবানের ইচ্ছা আমাদের জীবনের মাঝে পূর্ণ করিবার জন্য।'

সুতরাং, যাঁরা জীবনে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি, পরাগতি বা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করতে চান, গীতা যে শুধু তাঁদেরই পথ-প্রদর্শক, তাই নয়, যাঁরা আদর্শ সমাজ রচনা করতে চান, বাইবেলের ভাষায় যাঁদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে to establish the kingdom of Heaven on Earth, গীতা থেকে তাঁরাও যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করবেন। গীতার শিক্ষাকে কি ভাবে ব্যষ্টি-জীবনে ও সমষ্টি-জীবনে প্রয়োগ করা যায়, সে সম্পর্কে আমি দীর্ঘকাল পূর্বে 'গীতায় জীবনবাদ' নামক পুস্তিকায় আলোচনা করেছিলাম। সে আলোচনা ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত। তারপর, লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিক 'শনিবারের চিঠিতে' ধারাবাহিক ভাবে 'গীতায় সমাজদর্শন' সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি। সেই প্রবন্ধগুলি অধুনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। 'জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ' প্রবন্ধটি অবশ্য পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

পরিশেষে বক্তব্য, শ্রীশ্রীঅক্ষয় ধর্ম মহাসভার (অবন্তীপুর, মণ্ডলপাড়া, চব্বিশ পরগণা) পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র দে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গ্রন্থখানি প্রকাশের ভার গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতপাশে বদ্ধ করেছেন। পার্থসারথির আশীর্বাদ তাঁর ওপর এবং শ্রীশ্রীঅক্ষয় ধর্ম মহাসভার অন্যান্য উদ্যোক্তাদের ওপর অজস্র ধারে বর্ষিত হ'ক।

জন্মাষ্টমী
১৩৫৭ বঙ্গাব্দ

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

১

সাগরে যেমন ঋজুগামিনী বক্রগামিনী নানা তটিনীর জলধারা এসে মিলিত হয়, তেমনি মহাভারতরূপ বিরাট সাগরে ভারতীয় সাধনার নানা ধারা এসে মিলিত হয়েছে। মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে গ্রথিত একখানি বিপুলকায় মহাকাব্য, আবার এই মহাকাব্যের একটিমাত্র পর্বের অন্তর্গত ভগবদ্গীতা নামক উপনিষদখানিও অষ্টাদশ অধ্যায়ে সাতশত শ্লোকে নিবদ্ধ। মহাভারতে বলা হয়েছে—গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দ, এই চারটি 'গ'-কারকে যিনি আশ্রয় করেছেন, তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। বাস্তবিক, এই চারটি 'গ'-কারই ছিল ভারতবর্ষের নানা বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ভিতর ঐক্যসূত্রস্বরূপ। বিশেষতঃ, ভারতের চিন্তাধারার উপর গীতার প্রভাব অতি বিপুল। (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বিষাদকে উপলক্ষ্য করে আমাদের শিখিয়েছেন, কেমন করে নানা মত ও নানা পথ একটিমাত্র লক্ষ্যের অভিমুখ হতে পারে, আর সে লক্ষ্য হচ্ছে জীবনে পূর্ণতা লাভ) জগদ্গুরু কৃষ্ণ সমাজ-সংস্কারক বা ধর্ম-সংস্কারকমাত্র (social or religious reformer) ছিলেন না, তিনি ছিলেন ধর্মসংস্থাপক। এই ধর্মসংস্থাপন ব্যাপারটা কি, তা আমরা ধীরে ধীরে বুঝতে চেষ্টা করব।

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভগবদ্গীতার কত ভাষ্য রচিত হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও কত হবে কে জানে। গীতার প্রাচীন ভাষ্যকারেরা যে আধুনিক মনের সকল প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারেননি, বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম সে কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি গীতার ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্রেরও পূর্বে রাজা রামমোহন তাঁর বহু পুস্তক-পুস্তিকায় গীতার বচন উদ্ধৃত করেছেন, কোথাও কোথাও তিনি গীতার উপর নূতন আলোক সম্পাত করেছেন। (শোনা যায়, তিনি নাকি সমগ্র গীতার অনুবাদও করেছিলেন।) আধুনিক কালে যাঁরা গীতা-ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হয়েছেন বা গীতা সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন,

তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণানন্দ স্বামী বা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাল গঙ্গাধর তিলক ও শ্রীঅরবিন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাত্মা গান্ধী ও আচার্য বিনোবা ভাবে তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গীতার আলোচনা করেছেন।

গীতার ব্যাখ্যানকর্তাদের মধ্যে অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে। কোন কোন আচার্যের মতে গীতায় জ্ঞানযোগের প্রাধান্য, কারও কারও মতে ভক্তিযোগের প্রাধান্য, আবার বাল গঙ্গাধর তিলকের মতে ভগবান কর্মযোগেরই প্রবক্তা। কোন কোন মনীষীর মতে ভগবান গীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সাধন করেছেন। কিন্তু গীতাকে শুধু অধ্যাত্ম-শাস্ত্র হিসাবে গণনা করলে চলবে না। (মনে রাখতে হবে, গীতার বাণী অনুসরণ করেই মানুষ সিদ্ধি ও অভ্যুদয় লাভ করতে পারে। গীতায় স্বাস্থ্যনীতি আছে, মনস্তত্ত্ব আছে, শিক্ষা-বিজ্ঞানের সূত্র আছে, আবার সমাজ-দর্শন আছে।) আমরা এখানে প্রধানতঃ সমাজ-দর্শনের (Social Philosophy) দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ভগবদ্‌গীতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

গীতার প্রথম অধ্যায়ের নাম অর্জুনবিষাদ-যোগ। কিন্তু অর্জুনের বিষাদ যে অর্জুনেরই প্রকৃতির অনুকূল অথচ তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, প্রথমে সে কথাটা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। রামায়ণের আদিকাণ্ডে মহর্ষি বাল্মীকির কবিত্ব-লাভের কাহিনী আছে। নিষাদ-শরে নিহত ক্রৌঞ্চের বিয়োগে ক্রৌঞ্চীর কাতরতা বাল্মীকি একদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং নিষ্ঠুর ব্যাধের ক্রূর কর্মকে অন্তরের সঙ্গে ধিক্কার দিয়েছিলেন। মুনির শোক সেদিন অভিনব ছন্দে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ভারতের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা বলেছেন, বাল্মীকির শোক নিজের জন্য নয়—তাই সে শোক করুণরসে পরিণতি লাভ করেছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

('অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ, অগ্নিসম দেবতার দান,
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।'

বাস্তবিক, পৃথিবীতে মহৎ দুঃখ থেকেই মহৎ সৃষ্টি হয়ে থাকে।) জগতের আত্মকেন্দ্রিক মানুষেরা ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র দুঃখ নিয়েই ব্যস্ত, এই ক্ষুদ্র সুখ বা

ক্ষুদ্র দুঃখ হচ্ছে পরিমিত ও লৌকিক, কিন্তু বাল্মীকির বেদনা ছিল অলৌকিক, তাই তিনি করুণরসাত্মক অপূর্ব মহাকাব্য রচনা করে অমরতা লাভ করেছেন।

'যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে॥
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।'

—রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ২।৪০

ইহা অতিশয়োক্তি নয়। গঙ্গার পাবনী ধারার মতই রামায়ণী কথা চিরদিন পাপতাপ-দগ্ধ মানুষের তৃষ্ণাকলুষ নাশ করবে।

বাল্মীকির যে শোক থেকে শ্লোকের জন্ম হয়েছিল, সে শোক তমোগুণ থেকে উদ্ভূত নয়, সে শোক হচ্ছে সাত্ত্বিক শোক, তার উৎস হচ্ছে সর্বভূতে মৈত্রী ও করুণা।

আর একদিন শাক্যবংশীয় দেবদত্তের শরে আহত একটি রাজহংস-দর্শনে সিদ্ধার্থের মনে এই করুণারই সঞ্চার হয়েছিল। জন্ম-ব্যাধি-জরা-মরণ-পীড়িত নিখিল মানবের তথা ভূতগ্রামের বেদনা সিদ্ধার্থকে এমন বিচলিত করেছিল যে তিনি সকল ভোগৈশ্বর্য পরিত্যাগ করে সর্বভূতের হিতের জন্য মহানিষ্ক্রমণ করেছিলেন। সিদ্ধার্থের বেদনা নিজের জন্য নয়, তাই তাঁর বিষাদও সাত্ত্বিক বিষাদ। এই বিষাদ তাঁর মনে জাগিয়েছিল প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়, সত্য-সাক্ষাৎকারের জন্য দৃঢ় সংকল্প, সর্বপ্রকার দুঃখবরণে অবিচলা প্রবৃত্তি।

আমরা বলেছি, মহাভারতের একটি পর্বে (ভীষ্মপর্বে) ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ্ নিবদ্ধ হয়েছে। গীতা বলতে আমরা এই ভগবদ্গীতাকেই সাধারণতঃ বুঝে থাকি। এই গীতার আরম্ভ হচ্ছে অর্জুনের বিষাদে। অর্জুনের বিষাদের মূলে ছিল মোহ বা অজ্ঞান—যা সময় সময় মানুষের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। সুতরাং অর্জুনের বিষাদও তামসিক। কিন্তু আমাদের বিষাদের সঙ্গে অর্জুনের বিষাদের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। অর্জুন বুঝেছিলেন, কার্পণ্যদোষ বা দীনতা তাঁর স্বভাবকে আচ্ছন্ন করেছে, ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য-বিষয়ে তাঁর বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়েছে, তাই তিনি গোবিন্দকে বললেন, 'আমার পক্ষে কোন্‌টা শ্রেয়, তা নিশ্চিত করে আমায় বল, আমি যে তোমারই শিষ্য, তোমারই শরণাগত, তুমি আমায় শিক্ষা দাও।' স্বয়ং ভগবান যাঁর রথের সারথি, তাঁর বিষাদ কি শুধু তামসিক বিষাদ হতে পারে? তাই এ বিষাদ তাঁকে পরম কল্যাণের সন্ধান দিয়েছে।

সকলেই জানেন, শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনের অনুরোধে উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করেছিলেন, তখন পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, মিত্র, শ্বশুর ও সুহৃদ্‌গণকে দর্শন করে অর্জুন অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হয়ে বলেছিলেন (কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ), 'যুদ্ধাভিলাষী আত্মীয়গণকে সমবেত দেখে আমার দেহ অবসন্ন হচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, আমার দেহে কম্প ও রোমাঞ্চ হচ্ছে, ত্বক যেন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।' বলা বাহুল্য, বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন দয়ার বশীভূত হয়ে এ কথাগুলো বলেননি, আত্মীয়বধের চিন্তায় তাঁর বুদ্ধি সাময়িক ভাবে মোহগ্রস্ত হয়েছে। অর্জুন অবশ্য যুদ্ধ না করার পক্ষে অনেক যুক্তি উপস্থিত করেছেন, 'স্বজনেরা আততায়ী হলেও তাঁদের বধ করে আমরা পাপভাগী হব, আত্মীয়গণকে বধ করে আমরা সুখী হতে পারব না, কুলক্ষয় করার দোষ আমাদিগকে আশ্রয় করবে, মিত্রদ্রোহে পাতক ঘটবে।' অর্জুন এখানে সনাতন কুলধর্মের কথা এবং কুলধর্ম নষ্ট হ'লে সমাজে যে অনাচার দেখা দেয় সেই অনাচারের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্জুনের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হলেও তাঁর কথায় কিন্তু যুক্তির অভাব হয়নি। অবশ্য, অর্জুনের বিচারবুদ্ধি সেকালের সমাজ-ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, অর্জুনেব মোহের মূলে রয়েছে স্বার্থবুদ্ধি। 'স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব', 'হে মাধব! আত্মীয়গণকে বধ করে আমরা কেমন করে সুখী হব?'—এই ছিল অর্জুনের মনের কথা। তথাপি বিষণ্ণ অর্জুনের মন নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সংশয়াকুল হয়েছিল। তাই তিনি স্বয়ং ভগবানের শরণাপন্ন হলেন। আর অর্জুনকে উপলক্ষ্য করেই শ্রীভগবান গীতারূপ অমৃত পরিবেশন করলেন।

ভারতীয় দর্শনের গোড়ার কথাও দুঃখবাদ, তাই বলে ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী নয়। এ দেশের ঋষিগণ দুঃখের শ্রেণীবিভাগ করেছেন, দুঃখের কারণ নির্দেশ করেছেন এবং দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় সম্পর্কেও সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন। বুদ্ধদেবও চারটি আর্য-সত্যের কথা বলেছেন। তা হচ্ছে এই: ১. দুঃখ আছে, ২. দুঃখের কারণ আছে, ৩. দুঃখের নিবৃত্তি আছে এবং ৪. দুঃখনিবৃত্তির উপায় আছে। যিনি মানুষকে দুঃখনিবৃত্তি, নির্বাণ বা অমৃতত্বের পথ দেখিয়েছেন, তাঁকে কেমন করে দুঃখবাদী বলা যায়? বাস্তবিক, দুঃখবাদ থেকে ভারতীয় দর্শনের জন্ম হলেও এর লক্ষ্য হচ্ছে—

দুঃখনিবৃত্তি বা অমৃতত্ব লাভ, অপবর্গ, কৈবল্য বা মোক্ষ। ভগবদ্‌গীতারও আরম্ভ বিষাদযোগে আর পরিসমাপ্তি মোক্ষযোগে। সংসারে দুঃখ হচ্ছে প্রত্যক্ষ সত্য, এ সত্যকে ভারতীয় মনীষা অস্বীকার করেনি। কিন্তু দুঃখবাদ এ দেশের দার্শনিকদের চিত্তে অবসাদ জাগায়নি। একে যদি pessimism বলি, তবে এ pessimism সুস্থ মনের পরিচায়ক (healthy), এইখানেই ভারতীয় দুঃখবাদের সঙ্গে সোপেনহাওয়ারের দুঃখবাদের পার্থক্য।

তাই জীবনের অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় বিষাদ নয়, অবসাদ। অবশ্য, আমাদের মন অনেক সময় বিষাদে এমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে তখন কোনও কর্মেই আমাদের উৎসাহ থাকে না, কোনও বিষয়েই আমরা আগ্রহ বা কৌতূহল অনুভব করি না। এরূপ ক্ষেত্রে বিষাদ একটি মানসিক ব্যাধি, এটি তমোগুণ থেকে সঞ্জাত। এই বিষাদ এনে দেয় অবসাদ দেহে ও মনে। মনোবিজ্ঞানেও বিষাদ একটি রোগের মধ্যে পরিগণিত। 'মেলাঙ্কোলিয়া' প্রভৃতি ব্যাধি যাকে অধিকার করে, তার জীবন হয় দুর্বহ, এ বোঝা নামাতে পারলেই সে যেন বাঁচে। আমাদের শাস্ত্রেও বলা হয়েছে, তমোগুণকে রজোগুণের দ্বারা জয় করতে হবে। যাদের ভেতর প্রাণশক্তির প্রাচুর্য আছে, দুর্বার উৎসাহ ও প্রচণ্ড অধ্যবসায় আছে, তাদের মন কিন্তু সহজে অবসন্ন হয় না।

(গীতায় ভগবান বলেছেন, 'আত্মার দ্বারাই আত্মার উদ্ধার সাধন করবে, আত্মাকে কখনও অবসন্ন হতে দেবে না। আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার আত্মাই আত্মার শত্রু।' বাস্তবিক শত্রু আমাদের বাইরে নয়, শত্রু রয়েছে ভেতরে। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা (Every man is the builder of his own destiny.)) তাই বুদ্ধদেব প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন, 'আত্মদীপ হয়ে বিহার কর, অনন্যশরণ হয়ে বিহার কর।' আমাদের জীবনটাই তো একটা বিরামহীন সংগ্রাম, আর এই সংগ্রামে জয়ী হতে হলে সর্বপ্রথম অবসাদকে দূর করতে হবে। তাই আমাদের প্রত্যেকের প্রতি শ্রীভগবানের অমোঘ নির্দেশ হচ্ছে—('নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ', 'আত্মাকে কখনও অবসন্ন হতে দেবে না', 'মামনুস্মর যুধ্য চ', 'আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর।' 'মামনুস্মর যুধ্য চ', কারণ 'God helps those who help themselves.') এই প্রসঙ্গে আপনারা হরিকুলেশ* (Hercules) ও গো-শকটচালকের গল্পটি স্মরণ করুন।

* কবি নবীনচন্দ্রের 'প্রভাস' কাব্যের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

আমরা যে অর্থে নৈরাশ্য কথাটির ব্যবহার করি, সে অর্থে তা যে শুধু সাধনার বিঘ্ন তাই নয়, ব্যক্তি ও জাতির জীবনে তা অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়। অবশ্য, প্রাচীন পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে 'নৈরাশ্য' বলতে বুঝেছেন বাসনার বন্ধন থেকে মুক্তি। সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে, 'নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ', অর্থাৎ পিঙ্গলার মত যিনি নিরাশ হতে পারেন (বাসনাকে জয় করতে পারেন), তিনিই সুখী। পিঙ্গলা ছিলেন বিদর্ভ নগরের এক পতিতা নারী, তার রূপ ও ধনের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোন এক রজনীতে প্রসাধন-কার্য সমাপ্ত করে পিঙ্গলা প্রতীক্ষা করছিলেন কোনও বিলাসী নাগরিকের, কিন্তু সে রাত্রি তিনি জেগে রইলেন ব্যর্থ প্রতীক্ষায়। স্তব্ধ গভীর রাত্রিতে সহসা পিঙ্গলার চৈতন্যের উদয় হ'ল। তিনি বুঝতে পারলেন, আশা বা বাসনাই হচ্ছে সকল দুঃখের মূল। পিঙ্গলা তখন শয়ন করলেন এবং গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হলেন। কারণ—

'আশা বৈ পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম'।

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ, ৮ | ৪৪

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, অবধূতের চব্বিশ জন গুরুর ভেতর একজন ছিলেন শ্রীমতী পিঙ্গলা।

পিঙ্গলার নৈরাশ্য সত্ত্বগুণ থেকে উৎপন্ন কিন্তু আমরা যাকে নৈরাশ্য বলি, তা হচ্ছে তমোগুণ থেকে উদ্ভূত। তাই এ নৈরাশ্য বিষাদ ও অবসাদের নিত্য-সহচর। এ নৈরাশ্যকে জয় করতে না পারলে শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্যের ধ্বনি আমরা শুনতে পাব না।

২

অনেকের ধারণা আছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রেরণা দিয়ে ভারতবর্ষকে এক মহাশ্মশানে পরিণত করেছিলেন, অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই লোকক্ষয়কর মহাযুদ্ধ নিবারণের জন্য যথাশক্তি প্রয়াস পেয়েও ব্যর্থ হয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে পাণ্ডবদের কাছে যে প্রস্তাব পাঠিয়ে-ছিলেন, সেটা ছিল তাঁদের আত্মমর্যাদার পক্ষে বিশেষ হানিকর। ধৃতরাষ্ট্র চেয়েছিলেন, পাণ্ডবেরা যেন রাজ্যভোগের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে পরম

নিশ্চিন্ত মনে দিন যাপন করে। দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর পর তারা যেন লোকক্ষয়কর যুদ্ধের রক্তাক্ত পথে পদার্পণ না করে। দুর্যোধনের প্রতিজ্ঞা ছিল, 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্রমেদিনী'। তাই পুত্রস্নেহে অন্ধ পিতা সঞ্জয়কে দূতরূপে যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করলেন। এই অন্যায় অনুরোধ যুধিষ্ঠির প্রত্যাখ্যান করলেন। পাণ্ডবেরা যুদ্ধ চাননি, দুর্যোধন যদি তাঁদের শুধু পাঁচখানা গ্রাম দিতেও সম্মত হতেন, তা হ'লেও এই মহাযুদ্ধ নিবারিত হতে পারত। অগণিত লোকক্ষয় যাতে না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শান্তির দূত হয়ে কৌরব-সভায় গমন করেন। পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। হিংসাপরায়ণ ও রাজ্যলোভী দুর্যোধন পিতাকে পরামর্শ দেন—'বাবা, এই শ্রীকৃষ্ণই সকল অনর্থের মূল। শ্রীকৃষ্ণ এখন আমাদের করায়ত্ত, আর এই শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পাণ্ডবদের প্রধান মন্ত্রণাদাতা, সুতরাং এঁকে যদি আমরা বেঁধে রাখি, তা হ'লে পাণ্ডবেরা জব্দ হবে। তারা আর আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে সাহসী হবে না।' দুর্যোধনের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। মহাভারতে এই বিশ্বরূপ-দর্শনের যে বর্ণনা আছে, তা অতুলনীয়। সেই রোমাঞ্চকর বর্ণনা পাঠকগণ পড়ে দেখতে পারেন। বিশ্বরূপ প্রদর্শন করে তিনি সবেগে সভা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, দুর্যোধন তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারলেন না। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রও মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে বিশ্বরূপ দেখেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থান করলে দুর্যোধন পিতাকে বললেন, 'শান্তির দূত হয়ে যিনি এসেছিলেন, তিনি একজন মায়াবী বা ঐন্দ্রিজালিক। যাদুবিদ্যা দেখিয়ে ইনি আমাদের বুদ্ধিকে একেবারে পরাভূত করে দিয়ে গেছেন।'

শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ অনিবার্য। এ যুদ্ধে অগণিত লোকক্ষয় হবে, সমগ্র ভারতভূমি মহাশ্মশানে পরিণত হবে। যুদ্ধের অবসানে দেশব্যাপী অনাচার, ব্যভিচার, অত্যাচার দেখা দেবে। কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির বিধান তো খণ্ডন করা চলে না।

কিন্তু এ বিষয়ে কুন্তীদেবীর অভিমত কি, তাও সুস্পষ্ট ভাবে জানা আবশ্যক। তাই শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীর কাছে সকল কথা নিবেদন করলেন। কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিদুলার কাহিনী বিবৃত করলেন।

মনস্বিনী বিদুলা ছিলেন সৌবীররাজ-মহিষী। তাঁর রাজ্য শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। বিদুলার একমাত্র পুত্র সঞ্জয়। তিনি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজ্যোদ্ধার করতে চাইলেন না, তিনি চাইলেন শত্রুর সঙ্গে এমন সন্ধি স্থাপন করতে যা তাঁর আত্মমর্যাদার পক্ষে হানিকর। তিনি গ্লানিকর প্রস্তাব নিয়ে জননীর কাছে উপস্থিত হলেন। জননী পুত্রকে কাপুরুষ বলে তিরস্কৃত করেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি পুত্রকে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করলেন। জননীর উৎসাহবাক্যে পুত্র শত্রুর সঙ্গে যথাশক্তি যুদ্ধ করলেন এবং শত্রু-কবলিত রাজ্য উদ্ধার করলেন। বিদুলা সঞ্জয়কে বলেছিলেন :

কু-নদী (খাল বিল প্রভৃতি) অল্প জলেই পূর্ণ হয়, মূষিকাঞ্জলি অল্পেই ভরে ওঠে, আর যারা কাপুরুষ, তারা অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়।

—মহাভারত, উদ্‌যোগপর্ব, ১২৪।৯

'যস্য বৃত্তং ন জল্পন্তি মানবা মহদদ্ভুতম্।
রাশিবর্ধনমাত্রং হি নৈব স্ত্রী ন চ বৈ পুমান্' ॥

—ঐ, ১২৪।২২

যাঁর মহৎ ও অদ্ভুত চরিত্রের কথা কেউ আলোচনা করে না, সে শুধু মানুষের সংখ্যাই বৃদ্ধি করে, প্রকৃতপক্ষে তাকে পুরুষ বা স্ত্রী কিছুই বল চলে না। (যেহেতু সে ক্লৈব্যকে আশ্রয় করেছে।)

'শ্রুতেন তপসা বাপি শ্রিয়া বা বিক্রমেণ বা।
জনান্ যোঽভিভবত্যন্যান্ কর্মণা হি সর্বৈ পুমান্' ॥

—ঐ, ১২৪।২৪

যিনি বিদ্যা, তপস্যা, ঐশ্বর্য বা বিক্রমের দ্বারা অপর সকলকে অভিভূত করেন, তিনিই যথার্থ পুরুষ।

বিদুলা সঞ্জয়কে বলেছিলেন, অর্চিহীন তুষাগ্নির মত ধূমায়িত হয়ে বাঁচবার ইচ্ছা করো না। (চিরকাল ধূমায়িত হয়ে থাকার চেয়ে মুহূর্তকাল জ্বলে ওঠা ভাল। পাশ্চাত্ত্য কবির কণ্ঠেও আমরা শুনতে পাই বিদুলার কথারই প্রতিধ্বনি :

'One crowded hour of glorious life
Is worth an age without a name.')

Quoted by Sir Walter Scot in 'Old Mortality', Ch. 34

সঞ্জয়ের প্রতি বিদুলার উপদেশ ব্যর্থ হয়নি। সঞ্জয়ের বুদ্ধি ক্ষণকালের জন্য মোহগ্রস্ত হয়েছিল, তিনি স্বধর্ম-ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। বিদুলার উপদেশে তিনি স্বধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য (peace-mission) ব্যর্থ হ'ল। তিনি বুঝতে পারলেন, এ ক্ষেত্রে দৈবই প্রবল। দৈব যেখানে প্রতিকূল, সেখানে মানুষের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। তথাপি মহামানবগণ প্রতিকূল দৈবের বিরুদ্ধে প্রাণপণে সংগ্রাম করে থাকেন। যুদ্ধ অনিবার্য জেনেও বাসুদেব রক্তক্ষয় নিবারণের জন্য শেষ চেষ্টা করলেন। তিনি ভাবলেন, কর্ণ যদি তাঁর জন্ম-রহস্য অবগত হয়ে কৌরবদের ত্যাগ করে পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেন, তা হ'লে তো কৌরবেরা স্বভাবতঃই দুর্বল হয়ে পড়বে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কর্ণকে রথে চড়িয়ে হস্তিনাপুর থেকে নির্গত হন এবং সকল কথা নিবেদন করে তাঁকে রাজ্যগ্রহণে প্রলুব্ধ করেন। কৃষ্ণ বলেন, কর্ণই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, সুতরাং তিনিই রাজ্যের অধিকারী। কৃষ্ণের অনুরোধ কর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তারপর কুন্তীদেবী কর্ণের নিকট গমন করেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয়, তাই হচ্ছে কর্ণকুন্তী-সংবাদ। মহাভারতের কর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে কুন্তীর অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর চরিত্রে কোন দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব নেই। (কর্ণকুন্তী-সংবাদে রবীন্দ্রনাথ কর্ণের চরিত্র ভিন্নরূপে অঙ্কিত করেছেন।) কর্ণ কুন্তীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার পর যুদ্ধ-নিবারণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রয়াস একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণ যখন শান্তির দূত হয়ে কৌবব-সভায় গমন করেন, তখন তিনি বিদুরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। দুর্যোধনের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রদত্ত আহার্য গ্রহণ করেননি। তিনি পরম নীতিজ্ঞ, তিনি জানতেন, শত্রুর অন্ন গ্রহণ করতে নেই, শত্রুকেও আহার্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করতে নেই। দুর্যোধনকে তিনি বলেছিলেন :

'নাহং কামান্ন সংরম্ভান্ন দ্বেষান্নার্থকারণাৎ।
ন হেতুবাদাল্লোভাদ্বা ধর্মং জহ্যাং কথঞ্চন ॥'

—মহাভারত, উদ্‌যোগ পর্ব, ৮৪ | ২৪

লোকে ধর্মত্যাগ করে কেন? কাম, ক্রোধ, লোভ বা দ্বেষের বশীভূত হয়ে অথবা স্বার্থরক্ষার জন্য। আমি কাম বা ক্রোধ, দ্বেষ বা স্বার্থরক্ষা

(বিষয়বিশেষের প্রয়োজন), যুক্তি কিংবা লোভবশতঃ কখনও ধর্ম ত্যাগ করি না।

আমাদের শাস্ত্রে এই ধর্ম কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। যা লোকসকলকে ধারণ করে, তাই ধর্ম; যা রাষ্ট্ররক্ষা বা সমাজস্থিতির মূল, তাই ধর্ম। যা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই ধর্ম, সুতরাং ধর্ম বলতে বোঝায় Justice and Equity, আবার যা মানুষকে শ্রেয়ের পথে নিয়ে যায়, তাই ধর্ম। প্রাকৃতিক ধর্ম, ব্যবহারিক ধর্ম, আনুষ্ঠানিক ধর্ম, সবই ধর্মের অন্তর্গত; আবার শাশ্বত ধর্ম আছে, যুগধর্ম আছে, আপদ্ধর্মও আছে। আবার অধিকারভেদ অনুসারে ধর্মেরও ভেদ আছে। একজনের পক্ষে যেটা ধর্ম, আর একজনের পক্ষে সেটা অধর্ম হতে পারে। এই অধিকারভেদ গুণভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' এটা সত্য বটে কিন্তু সকলের পক্ষে বা সকল অবস্থায় নয়। এইজন্য একটি শ্লোকে বলা হয়েছে,('অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টা সন্তুষ্টাশ্চৈব পার্থিবাঃ') ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হ'লে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন, আর রাজারা সন্তুষ্ট হ'লেই সর্বনাশের কারণ ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দ এই অধিকারবাদকে বলেছেন marvellous doctrine বা বিস্ময়কর মতবাদ। অবশ্য এই অধিকারবাদের অপব্যবহার হয়েছে কি না, সে কথা স্বতন্ত্র। মহাত্মা গান্ধী কিন্তু ভারতীয় সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েও এই অধিকারবাদের মর্মে প্রবেশ করতে পারেননি। তাই তাঁর দৃষ্টিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটা রূপক মাত্র, তাঁর মতে গীতায় ভগবান অহিংসা, সত্য, অনাসক্তি বা ত্যাগ এবং লোকহিতকর কর্মের আদর্শই স্থাপন করেছিলেন।

গীতায় কিন্তু ভগবান অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধে প্রবর্তিত করেছেন। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, সেই পৃথিবী শুধু কর্মভূমি নয়, সমরভূমিও বটে। এখানে আমাদের ক্লৈব্য ত্যাগ করে বীরের মত যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধ হচ্ছে ধর্মযুদ্ধ। এই মহা-কুরুক্ষেত্রে আমাদের বুদ্ধি যখন মোহগ্রস্ত হয়, তখন একমাত্র গীতার বাণীই আমাদের মোহপ্রবুদ্ধ করতে পারে।

ভারতীয় ধর্ম মানুষকে ইহকাল-বিমুখ করে না, এ ধর্ম স্বর্গ ও মর্ত্যে সেতু রচনা করে। আমাদের দেশের দার্শনিক ঋষি বলেছেন, যার দ্বারা অভ্যুদয় (পার্থিব উন্নতি) ও নিঃশ্রেয়স্ (মুক্তি) লাভ হয়, তাই হচ্ছে ধর্ম। (দেহকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখা, ন্যায়ের পথে থেকে ধন উপার্জন করা, সর্বপ্রকার

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, লোকের হিতসাধন করা, যথাসাধ্য সদাচার পালন করা, এ সকলই ধর্মের অন্তর্গত) যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেই ধর্ম, আর যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয়, 'যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মঃ যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'।

আবার আমরা যাকে চরিত্রনীতি (Ethics) বলি, তাও এই ধর্মেরই অন্তর্গত। এই চরিত্রনীতি জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই পালনীয়। এই উদার ও বিশ্বজনীন চরিত্রনীতির প্রবক্তা হচ্ছেন মনু। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে :

'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্' ॥

—মনুসংহিতা ৬।৯২

'ধৈর্য, ক্ষমা, সংযম, অচৌর্য, দেহ ও মনের শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্যকথন ও অক্রোধ'—এই দশটি হচ্ছে ধর্মের লক্ষণ।

৩

আমাদের পুরাণসমূহে যে দেবাসুর-সংগ্রামের কথা বর্ণিত হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে বারে বারে তার অভিনয় চলেছে। বলদৃপ্ত অত্যাচারী অসুরগণের বিরুদ্ধে দেবগণের সংগ্রাম স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠারই সংগ্রাম। এই যুদ্ধের প্রারম্ভে অসুরদিগের জয়, দেবগণের পরাজয়; পরিণামে দেবগণের জয়, অসুরবর্গের পরাজয় ও বিনাশ।

আবার আমাদের অন্তর্জগতেও নিরন্তর চলেছে দৈবী ও আসুরী প্রবৃত্তির সংগ্রাম। যিনি আসুরী প্রবৃত্তিকে জয় করার জন্য যথাশক্তি প্রয়াস করেন, তিনিই ধর্মযোদ্ধা। আমাদের অন্তর্জগতে যা ঘটে, বহির্জগতেও তাই ঘটে থাকে। এইজন্যই সাধক বলেন, 'যা নেই ভাণ্ডে, তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে।'

মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্বে দেখতে পাই, পার্থসারথি মোহগ্রস্ত অর্জুনকে তত্ত্বোপদেশের দ্বারা মোহপ্রবুদ্ধ করছেন। কিন্তু অর্জুন হচ্ছেন শ্রীভগবানের বাণীর উপলক্ষ্যমাত্র, এ বাণী সর্বদেশের সর্বকালের মানবের পক্ষেই অমৃতের বার্তা বহন করে আনছে। কৌরবপক্ষের বিরুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের সংগ্রাম হচ্ছে অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তাই পাণ্ডবেরা ধর্মযুদ্ধে

প্রবৃত্ত, কুরুক্ষেত্র তাই ধর্মক্ষেত্র। মহাভারতে অর্জুন হচ্ছেন নরোত্তম নর, তাঁর চরিত্রে নানা বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ ঘটেছে, শৌর্যে-বীর্যেও তিনি অপরাজেয়, অথচ তাঁর বুদ্ধি সাময়িকভাবে মোহগ্রস্ত হয়েছে। অর্জুনের মনে সহসা সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়নি, তমোগুণ তাঁর কর্তব্যবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছে। শ্রীভগবান জানতেন যে, প্রকৃতিজ গুণের বশীভূত হয়েই অর্জুনকে যুদ্ধ করতে হবে, তাঁর সাময়িক কৃপাবিষ্টতা ক্লৈব্য বা হৃদয়-দৌর্বল্যেরই নামান্তর মাত্র। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের সমরকে অ্যালিগরি (allegory) বা রূপক মনে করবার কোন কারণ নেই। তবে যাঁরা কুরুক্ষেত্রের সমরকে অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে দেখবেন, তাঁরাও শ্রীভগবানের বাণী থেকে পরম কল্যাণ লাভ করবেন। সম্প্রতি মনস্বী ডি. টম্সন্ (D. Thomson) The Bhagavad Geeta and the West নামক প্রবন্ধে কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামের রূপক ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

'When Arjuna is admonished by Lord Krishna to go forward into battle and not to hold back—this should never be understood as a material concept. To face the challenge of life and the darkness within our own natures unflinchingly so resolving the conflict—seems more the message of this passage.

'Surely the kinsmen whom Arjuna shrank from slaying are the forces of darkness which are only one and the same—in their essence—as the eternal light. It is upon the darkness that the light can manifest and the evolving human soul can only do so by its experiences in matter. Kurukshetra—the battle-field of existence—is the field of our experience, and the play of the polarities is inevitable for the unfolding of our consciousness. The cycle of our lives moves ever from darkness into light unceasingly—for without it no manifestation would be possible.' (Hinduism, —January, 1965)

তবে, এক হিসাবে পৃথিবীর প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ পুরুষই যোদ্ধা, তাঁরা সংগ্রাম করেন অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই কর্তব্য। বৈদিক ঋষি তাই প্রার্থনা করেছেন, 'হে মন্যুস্বরূপ, অন্যায়ের প্রতি যে পবিত্র ক্রোধ আমাদের ভেতর তা সঞ্চারিত করো'। দুষ্ট বা দুর্বৃত্তদের কঠোর হস্তে দমন করা প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কর্তব্য। আর যেখানে জনশক্তি দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাগ্রত হয়, সেখানেই রাষ্ট্রের শাসন সহজসাধ্য হয়। ভারতের প্রাচীন রাজনীতিতে বলা হয়েছে, 'রাজা যদি অদণ্ড্যকে দণ্ডিত করেন আর দণ্ডনীয় ব্যক্তির দণ্ডবিধান না করেন, তাহলে তিনি ইহলোকে অযশ প্রাপ্ত হন এবং পরলোকে নরকগামী হন।' —মনুসংহিতা, ৮ | ১২৮

আমাদের মনে রাখতে হবে যে সংসারে দুর্বলতা বা ভীরুতার মত পাপ নেই। অহিংসা বা ক্ষমা পরম ধর্ম বটে কিন্তু দুর্বলের জন্য নয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি সর্বদা আমাদের স্মরণীয়।—

'ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।'

—নৈবেদ্য

অতএব এই সংসার কর্মভূমিও বটে, আবার সমরাঙ্গনও বটে। কিন্তু এই সংসাররূপ কুরুক্ষেত্রে প্রত্যেককেই কর্মের কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। এ সম্পর্কে পার্থসারথির নির্দেশ এই—প্রত্যেক নরনারীকে যথাশক্তি স্বধর্মের আচরণ করতে হবে। কিন্তু এই স্বধর্ম কি? আর পরধর্মই বা কি? সংস্কৃত ভাষায় 'ধর্ম' কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, সুতরাং স্বধর্ম কথাটিরও নানা ব্যাখ্যা করা যায়। তথাপি পার্থসারথি গুণগত ধর্ম অর্থেই প্রধানতঃ কথাটির ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় সমাজে যে চাতুর্বর্ণ্যের ব্যবস্থা ছিল তা এই

ত্রিগুণতত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে হলে ত্রিগুণতত্ত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

(মানুষে মানুষে যে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক বৈষম্য আছে, এ কথা এ কালের মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেছেন। পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষাবিদগণ বলেছেন—মানসিক শক্তির তারতম্য অনুসারে শিক্ষার্থিগণকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। এক রকমের শিক্ষা সকলের পক্ষে উপযোগী হতে পারে না। শিক্ষাদাতা শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি পরীক্ষা করে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু মানুষে মানুষে শুধু বুদ্ধির পার্থক্য নয়, গুণগত পার্থক্যও রয়েছে। এই পার্থক্য অনুসারে মানুষের কর্মও পৃথক হয়ে থাকে। তাই একজনের পক্ষে যেটা স্বধর্ম আর একজনের পক্ষে সেটা পরধর্ম। মানুষ স্বধর্মের অনুবর্তন করেই পরম কল্যাণ লাভ করে। শ্রীভগবান বলেছেন, প্রকৃতি-নির্দিষ্ট কর্ম করে মানুষ কখনও কিল্বিষ প্রাপ্ত হয় না। পরধর্ম উত্তমরূপে আচরিত হওয়ার চাইতে স্বধর্ম অঙ্গহীন হওয়াও ভাল। স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়, তথাপি পরধর্ম ভয়াবহ। গান্ধীজী লিখেছেন—

'সমাজে একের ধর্ম ঝাড়ু দেওয়া ও অপরের ধর্ম হিসাব রাখা) হিসাব-রক্ষাকারীকে উত্তম বলা হয় বলিয়া ঝাড়ুদার যদি নিজের ধর্ম ছাড়ে তাহা হইলে সে ভ্রষ্ট হইয়া যায় ও সমাজে হানি পৌঁছে। ঈশ্বরের দরবারে উভয় সেবারই মূল্য নিজ নিজ নিষ্ঠা অনুসারে পরিমিত হইবে। উপজীবিকার মূল্য সেখানে তো একই। উভয়েই যদি ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধি হইতে নিজের কর্তব্য করে, তবে উভয়ে মোক্ষের সমান যোগ্য হয়।' —শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, গান্ধী-ভাষ্য, পৃঃ ১৯১।

কিন্তু চোর যদি বলে, আমার স্বধর্ম চুরি করা, আমি যে চুরি করি, সেটা আমার স্বভাবেরই অনুবর্তন মাত্র, তবে তাকে কি উত্তর দিতে হবে? সংক্ষেপে আমরা বলব, যা লোকসংস্থিতির প্রতিকূল, যাতে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় আনে, তা কখনও কারও স্বধর্ম হতে পারে না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা অবশ্য স্বধর্ম বলতে বর্ণধর্ম বুঝতেন। সে কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই নিজ নিজ ধর্ম বা কর্তব্যের অনুসরণ করতেন, তাই তাঁরা প্রত্যেকেই সমাজের স্থিতিরক্ষার সহায়তা করতেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরা কারও জন্যই চৌর্য, ব্যভিচার প্রভৃতি অপকর্মের ব্যবস্থা করেননি। অবশ্য একটি সংস্কৃত শ্লোকে পাওয়া যাচ্ছে, মনু মহারাজের আদেশ হচ্ছে, শত অপকর্ম করেও পরিবার প্রতিপালন

করবে (অপকর্মশতং কৃত্বা ভর্তব্যা মনুরব্রবীৎ) কিন্তু টীকাকারদের মতে সেখানে অপকর্মের মানে আলাদা। অপকর্ম অর্থে নিষিদ্ধ কর্ম নয়, ব্রাহ্মণ যদি শুধু স্বজনপোষণের জন্য ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন করেন অথবা ক্ষত্রিয় যদি বৈশ্যের বৃত্তি আশ্রয় করেন, তবে সেটাই হবে তার পক্ষে অপকর্ম। অপকর্ম অর্থে অপকৃষ্ট কর্ম হতে পারে না; কেননা, মানুষের কর্মের ভেতর বড়ছোট নেই। মহাভারতেও দেখতে পাই, ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করেছেন, আবার রামায়ণে দেখি, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য তপস্যা করছেন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে চাতুর্বর্ণ্যের কথা বলেছেন সেটা বংশগত চাতুর্বর্ণ্য নয়, গুণগত চাতুর্বর্ণ্য। মানুষ প্রকৃতির অনুবর্তন করে কি ভাবে পরম কল্যাণ লাভ করতে পারে, শ্রীভগবান সেই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছেন।

সমাজদর্শনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে ব্যক্তির জন্যই সমাজ আর সমাজতন্ত্রবাদীর মতে সমাজ বা সমষ্টির কল্যাণের জন্যই ব্যষ্টির অস্তিত্ব। শ্রীভগবান যাকে স্বধর্ম বলেছেন, তার অনুসরণের ভেতর দিয়েই প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। আবার শ্রীভগবান যজ্ঞার্থে বা সমষ্টির কল্যাণার্থে কর্ম করারও নির্দেশ দিয়েছেন। গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের ভেতর সমন্বয় সাধন করেছেন। মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণের সঙ্গে জনকল্যাণের কোন বিরোধ তো নেই-ই, বরঞ্চ ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের উপরেই যে সমাজের বিকাশ নির্ভর করছে, এ কথা এ যুগের প্রায় প্রত্যেক মনীষীই স্বীকার করেছেন। মনস্বী ম্যাকেঞ্জি বলেছেন—

'We can realise the true self or the complete good only by realising social ends.'

আমরা বলেছি, সংসার কর্মক্ষেত্রও বটে, আবার সংগ্রামক্ষেত্রও বটে। সংসারে তাই ভীরু, কাপুরুষ বা দুর্বলের কোন স্থান নেই। অবশ্য এখানে বীরপুরুষদের বুদ্ধিও সাময়িক ভাবে মোহগ্রস্ত হতে পারে এবং তাঁরা সংগ্রামে বিমুখ হতে পারেন। নতুবা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে অর্জুনের মত বীরের এমন বৈক্লব্য দেখা দেবে কেন? তিনি যে পরন্তপ, শত্রুগণকে সন্তপ্ত করার মত শক্তি যে তাঁর ভেতরেই নিহিত রয়েছে সে সম্পর্কেও যেন তিনি সচেতন নন। যারা ভীরু ও সংগ্রামবিমুখ, তাদের প্রতি পার্থসারথির নির্দেশ হচ্ছে এই,

তোমরা ক্লীবতা আশ্রয় করো না। ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য পরিহার করে সংগ্রামের জন্য উত্থিত হও। মনস্বিনী বিদুলাও তাঁর পুত্র সঞ্জয়কে এই কথাই বলেছিলেন। যাঁর মনে কর্মের প্রবৃত্তি রয়েছে, সংগ্রামের বাসনা রয়েছে, তিনি যদি কর্ম ত্যাগ করেন, তবে সেটা হবে মিথ্যাচার। শ্রীভগবান এই রকম মিথ্যাচারের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, যাঁদের কর্ম করার প্রয়োজন নেই তাঁরাও লোকশিক্ষা বা লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করবেন, কোন অবস্থাতেই কর্ম ত্যাগ করবেন না।

শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন, শুধু স্বধর্ম-রক্ষার জন্য নয়, কীর্তিলাভের জন্যও তোমার যুদ্ধ করা উচিত। বাস্তবিক, কীর্তিলাভের বাসনা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যাঁরা ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রজোগুণী পুরুষ, তাঁদের পক্ষে এই কীর্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা নিন্দনীয় তো নয়ই, বরং প্রশংসনীয়। সংসারে অনেক মহৎ কর্মের মূলেই যে এই যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান, সে কথা সকলেই স্বীকার করবেন। হিতোপদেশকার লিখেছেন—

'বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা
সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ,
যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ
প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাম্॥'

(বিপদে ধৈর্য, সম্পৎকালে ক্ষমা, সভাস্থলে বাগ্মিতা, যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্রম, যশে অভিরুচি এবং শাস্ত্রে অনুরাগ—এগুলি মহাত্মাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ)।

এই কীর্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা যে অর্জুনের ভিতর প্রচুর পরিমাণেই ছিল তা শ্রীভগবান জানতেন। তাই মোহগ্রস্ত অর্জুনকে তিনি কীর্তিলাভের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন।

৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ব্রত ছিল ধর্ম-সংস্থাপন—ধর্ম-সংস্কার নয়। ধর্ম-সংস্থাপন আর ধর্ম-সংস্কার যে এক কথা নয়, এই সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য কর্মের মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া যায় না।

ইংরেজিতে Religious reformer বলে একটা কথা আছে, আমরা বাংলায় তার তর্জমা করি 'ধর্ম-সংস্কারক'। আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই,

কোন দেশে যখন প্রচলিত ধর্মে নানা বিকৃতি দেখা দেয়, তখন সেই দেশে প্রায়ই একজন ধর্ম-সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। তিনি প্রচলিত ধর্মের বিকৃতিগুলোকে দূর করেন, কালক্রমে কোনও ধর্মের ভিতর যে সব জঞ্জাল বা আবর্জনা জমে ওঠে, তিনি সেগুলোকে অপসারিত করেন ; কিন্তু অনেক সময়ে নবধর্ম-প্রচারের উৎসাহে তিনি প্রচলিত ধর্মের একেবারে মর্ম-মূলে আঘাত করেন। প্রচলিত ধর্মের ভিতর যে সত্য নিহিত আছে, সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি অন্ধ বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অকল্যাণকে দূর করতে গিয়ে তিনি কল্যাণের আদর্শকেও আঘাত করেন। কিন্তু যিনি ধর্ম-সংস্থাপক, তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ, সুতরাং প্রাচীন বিধানকে ভেঙ্গে ফেলে নতুন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি অন্তরে কোনও উন্মাদনা অনুভব করেন না। বাইবেলের ভাষায় বলতে হয়, তিনি আবির্ভূত হন 'not to destroy but to fulfil the law and the prophets.' গান্ধীজীও 'ধর্ম-সংস্থাপন' কথাটির অর্থ করেছেন 'ধর্মের পুনরুদ্ধার'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য—একদিকে ধর্মের গ্লানি দূর করা ও অধর্মের অভ্যুত্থান নিরোধ করা, অপর দিকে প্রচলিত ধর্মকে প্রাপ্য মর্যাদা দান করে বিশ্বমানবের কাছে পরম কল্যাণ বা নিঃশ্রেয়সের (summum bonum) আদর্শ স্থাপন করা—এই মহান ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই তাঁর আবির্ভাব। মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বলেছেন, 'যিনি এই বেদপ্লাবিত দেশে প্রচার করিয়াছিলেন—ধর্ম যজ্ঞে নহে, ধর্ম লোকহিতে···ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।' কবি নবীনচন্দ্রও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রেখেও বলব, শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নয়। মহাভারতের কর্ণপর্বে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'যা প্রজাকুলকে ধারণ করে, তাই হচ্ছে ধর্ম। শ্রুতিতে ধর্মের বিধান আছে, কিন্তু একমাত্র শ্রুতিতেই ধর্ম নেই।' ভীষ্ম-পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় তিনি বলেছেন, 'যাগযজ্ঞাদি সকাম কর্মের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হতে পারে কিন্তু নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয় না। পুণ্যক্ষয় হলে আবার স্বর্গ থেকে পতন ঘটে। যাঁরা বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁদেরও পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মগ্রহণ করতে হয়। যাঁরা ত্রিগুণের অধীন, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ তাঁদেরই জন্য, হে অর্জুন! তুমি ত্রিগুণাতীত হও।' দেখা যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক যাগযজ্ঞাদির নিন্দা করেননি, তিনি এ কথা

কখনও বলেননি যে যাগযজ্ঞাদি একেবারেই নিষ্ফল। চার্বাকাদি বেদবিরোধী সম্প্রদায়ই বেদের এবং বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছেন। যেমন চার্বাক সম্প্রদায় বলেছেন 'বেদের কর্তা হচ্ছে তিনজন,—ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর।'

'ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ডধূর্তনিশাচরাঃ'।

শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বলেছেন, 'দ্রব্যময় যজ্ঞের চাইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ, সমস্ত কর্ম জ্ঞানেই পরিসমাপ্তি লাভ করে।'

'শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥'
—গীতা ৪।৩৩

আমাদের দেশে 'যজ্ঞ' কথার অর্থ যে কালক্রমে অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। যজ্ঞ হচ্ছে দেবতার উদ্দেশ্যে কৃত কর্ম, এ কর্ম সকাম হলেও এর অন্তর্নিহিত ভাবটি হচ্ছে ত্যাগ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আমরা আত্মপ্রীতি বা আত্মসুখের জন্যে যে সকল কর্ম করি, সে সকল কর্ম যদি ভগবৎ-প্রীতির জন্য বা লোকহিতের জন্য করা যায়, তবে তা হয়ে ওঠে যজ্ঞ। যজ্ঞের জন্য কৃত কর্ম ভিন্ন অপর কর্ম মানুষের বন্ধনের কারণ হয়। তাই শ্রীভগবান অর্জুনকে যজ্ঞার্থে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা জীবনটাকে কয়েকটি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কক্ষে বিভক্ত করার নির্দেশ দেননি। তাঁরা জানতেন, যিনি জীবনের সকল কর্মকে 'ধর্ম' বা 'যজ্ঞে' পরিণত করতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধার্মিক। আমাদের দেশের সাধক বলেন—

'প্রাতরুত্থায় সায়ং বা সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥'

হে জগন্মাতঃ! আমি প্রাতঃকালে ঘুম থেকে উঠে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত যা কিছু করি, সকলই তোমার পূজা। এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীরামপ্রসাদ গেয়েছেন—

'শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান
আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মারে,
যত শোন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।'

আমাদের শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে, জীবনের সকল কর্মকেই যজ্ঞে পরিণত করতে হবে। এর উপায় হচ্ছে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। এই পঞ্চ যজ্ঞের ভিতর দিয়েই আমরা দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও ঋষি-ঋন পরিশোধ করে থাকি।

এই পঞ্চ যজ্ঞ হচ্ছে—ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ।

'অধ্যয়নং* ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্'॥

—মনুসংহিতা ৩।৭০

অধ্যয়ন বা শাস্ত্রপাঠকে বলে ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণকে বলে পিতৃযজ্ঞ, হোমকে বলে দেবযজ্ঞ, মনুষ্যেতর প্রাণিগণকে (পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতিকে) আহারপ্রদানের নাম ভূতযজ্ঞ আর অতিথিসেবার নাম নৃযজ্ঞ। আমরা সবাই আমাদের শাস্ত্রকার ঋষিগণ, আমাদের পিতৃগণ, দেবগণ, ইতর প্রাণিগণ ও সমাজের নানা বৃত্তিধারী মনুষ্যগণের নিকট ঋণী। আমরা শাস্ত্রপাঠের দ্বারা ঋষি-ঋণ, তর্পণের দ্বারা পিতৃ-ঋণ ও হোমের দ্বারা দেব-ঋণ শোধ করি। ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞের ভিতর দিয়ে আমরা সর্বমানবে প্রীতিমান হই ও সর্বভূতে মৈত্রীভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হই। যে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক, সে যজ্ঞার্থে কর্ম করে না, আর যে শুধু আপন পরিবার বা পরিজন নিয়েই বিব্রত, সে আত্মকেন্দ্রিক মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ হলেও যজ্ঞবিহীন। শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—'যজ্ঞবিহীন লোকের ইহকালই নেই, পরকাল কেমন করে থাকবে? যে ভগবানের সেবার জন্য কিংবা লোকের হিতের জন্য কর্ম করে না, তাকেই বলা হয়েছে 'যজ্ঞবিহীন'। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হয়েছে—

'যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
যোঽধিকমভিমন্যেত† সস্তেন দণ্ডমর্হতি॥'

—ভাগবত, ৭ম স্কন্ধ, ৮ম শ্লোক।

যে পরিমাণ দ্রব্যে উদর পূর্ণ হয়, সেই পরিমাণ দ্রব্যেই দেহীদের অধিকার রয়েছে, যে তার চাইতে বেশী আত্মসাৎ করে, বা ভোগের অভিমান করে, সে চোর, তাই রাষ্ট্র তার দণ্ড বিধান করবে।

* অধ্যাপনমিতি পাঠভেদঃ
† অধিকং যোঽভিমন্যেত ইতি পাঠান্তরম্

গান্ধীজীও তাঁর গীতা-ভাষ্যে বলেছেন—

'মানুষ নিজের শরীর, বুদ্ধি ও আত্মা প্রভু-প্রীত্যর্থে, লোক-সেবার্থে যদি ব্যবহার না করে, তবে চোর বলিয়া গণ্য হয়। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে এই কথাটি রূপক আশ্রয় করে বলা হয়েছে।

যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে দেবতাগণ তোমাদের ঈপ্সিত ভোগ দান করবেন। তাঁদের দত্ত দ্রব্য তাঁদের না দিয়ে যে ভোগ করে, সে চোর।'

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক মিল বলেন, যাতে অধিকতম লোকের প্রভূততম সুখ হয়, তাই মানুষের করণীয়। এ কথা ভারতবর্ষে নতুন নয়। 'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়' কর্ম করতে হবে, এ ভারতবর্ষেরই কথা। পরহিতের জন্য যে কর্ম মানুষ করে, তাই তো হয়ে ওঠে যজ্ঞ। বৈজ্ঞানিকের মারণাস্ত্র-আবিষ্কারটা যজ্ঞ নয় বটে, কিন্তু লোক-কল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি যে বিজ্ঞান-সাধনা করেন, সেটাও হয়ে ওঠে যজ্ঞ। যা কিছু ত্যাগমূলক, তাই যজ্ঞ। লোকশিক্ষার জন্য বা লোক-সংস্থিতির জন্য মানুষ যা করে, তাও যজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ তো অর্জুনকে যুদ্ধ করার উপদেশ দিয়েছেন; কারণ, এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ ছাড়া ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে না। মানুষ যেখানে স্বার্থ-বুদ্ধি, লাভ-ক্ষতি বা জয়-পরাজয়ের চিন্তা বিসর্জন দিয়ে শুধু ধর্মরাজ্য-স্থাপনের জন্যই সংগ্রামে রত হয়, সেখানে সংগ্রামটাই হয় দেবতার পূজা বা যজ্ঞ। সংসারে যিনি যাজ্ঞিক, তিনিই ধন্য, কেননা, তিনি ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলিদান করেন।

যুদ্ধ বা সামরিক শক্তির প্রয়োগ যে কখনও কখনও অনিবার্য হয়ে ওঠে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এরূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়াটাই কাপুরুষতা। ভারতীয় বাহিনীর এক অনুষ্ঠানে (১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬৪) প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, 'নৈতিক বলের দ্বারা যদি অশুভ শক্তিকে পরাভূত করা সম্ভবপর না হয়, তা হলে আমাদের সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। সামরিক শক্তির প্রয়োগ আমাদের ঐতিহ্যবিরোধী নয়, আমাদের শাস্ত্রে সামরিক শক্তিপ্রয়োগের বিধান রয়েছে।' যাঁরা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা সকলেই ডঃ রাধাকৃষ্ণণের কথাগুলির সত্যতা স্বীকার করবেন। আমাদের শাস্ত্রে অবৈধ হিংসার কথা আছে, বৈধ হিংসার কথাও আছে, আবার অবৈধ অহিংসার কথা আছে, বৈধ অহিংসার কথাও আছে। সকলেই জানেন, দণ্ডনীতির প্রয়োগ না

করলে রাষ্ট্ররক্ষা হয় না কিন্তু রাষ্ট্ররক্ষা করতে গেলেই সমাজ বা রাষ্ট্রের যারা শত্রু, তাদের দণ্ড বিধান করতে হবে। তাই রাষ্ট্রকে সময়ে সময়ে বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিতে হয়। মনস্বী ম্যাকেঞ্জী (Mackenzie) এ সম্পর্কে বলেছেন—

'The force which it (the state) has to exercise has two main forms—that which is directed towards inner control, and that which is directed towards outward defence··· A wise ruler seeks friendly relations both within and without, and it is only when he fails to secure such relations that the exercise of force becomes necessary. (Outlines of Social Philosophy, p. 133)

দেখা যাচ্ছে, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রকে সময়ে সময়ে বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে দণ্ডনীতির আশ্রয় নেওয়াই ধর্ম, আর অন্যায়ের প্রতিবিধান না করাই অধর্ম।

গীতায় শ্রীভগবান লোকসংগ্রহের কথাও বলেছেন। সমাজদর্শনে 'লোক-সংগ্রহ' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষ্যকারেরা 'লোক-সংগ্রহ' বলতে বুঝেছেন—লোকসমূহকে স্বধর্মে প্রবৃত্ত করা এবং তাদের স্বেচ্ছাচারিতা বা উন্মার্গগামিতা নিবারণ করা। ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—

'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥'

—গীতা ৩।২০

জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্মের দ্বারাই পরমা সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। লোক-সংগ্রহের জন্যেও (অর্থাৎ লোকসমূহকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও) তোমার কর্ম করা উচিত। শ্রীভগবান বলছেন—কর্মের উদ্দেশ্য হবে লোকহিত। অবশ্য, এই লোকহিতের সঙ্গে যথার্থ আত্মহিতের কোনও বিরোধ নেই। পাশ্চাত্য নীতিবিজ্ঞানে (Ethics) যাঁরা পূর্ণতাবাদ বা Perfectionism-কে আদর্শ হিসাবে স্বীকার করেছেন, তাঁরাও বলেন, মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ এবং অপরের কল্যাণের ভিতর শুধু যে কোনও বিরোধ নেই, তাই নয়, অপরের কল্যাণ-সাধনের ভিতর দিয়েই মানুষকে নিজের কল্যাণ লাভ করতে হবে।

সুতরাং মানুষের পক্ষে কল্যাণ-লাভের উপায় কৃচ্ছ্রসাধন নয়, স্বধর্মের আচরণ বা প্রকৃতিনিয়ত কর্মের অনুষ্ঠান। এ বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য মনীষী ম্যাকেঞ্জী যা বলেছেন, তা যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীরই প্রতিধ্বনি—

'Each person is regarded as having his place and function in a social system that is aiming, with more or less complete consciousness, at the realisation of a perfect humanity and what is important for each individual is to find his appropriate station within that system and to fulfil the duties that belong to that station.'

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোথাও কৃচ্ছ্রসাধনের পরামর্শ দেননি। তিনি বলেছেন, কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ দুটোই মোক্ষের উপায় বটে, কিন্তু কর্মসন্ন্যাসের চাইতে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। কারণ, সমাজের ভিতর বাস করে এবং স্বধর্ম পালন করেই মানুষ যথার্থরূপে নিজের ও অপরের কল্যাণ সাধন করতে পারে, কিন্তু কর্মসন্ন্যাসের দ্বারা শুধু ব্যষ্টির কল্যাণই সাধিত হতে পারে।

৫

আমরা দেখেছি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্মসন্ন্যাসের চাইতে কর্মযোগেরই প্রাধান্য স্বীকার করেছেন, অথচ তিনি বলেছেন, কর্মসন্ন্যাসের দ্বারাও মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে পরম মঙ্গল লাভ করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের উক্তির তাৎপর্য এই যে, কেউ যদি কর্মত্যাগের অধিকারী হয়েও থাকেন, তবু তিনি লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করবেন। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও কর্মে আসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তির বুদ্ধিভেদ জন্মাবেন না, তিনি যোগযুক্ত হয়ে সম্যক্‌রূপে সকল কর্ম আচরণ করে তাকে কর্মে প্রবর্তিত করবেন।'

'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব কর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

—গীতা ৩।২৬

আমরা মহাভারতে দেখতে পাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক আচারকেও লঙ্ঘন করেননি, কারণ, তিনি জানতেন, উত্তম পুরুষেরা যেমন আচরণ করেন, সাধারণ লোকে তারই অনুসরণ করে। আমরা দেখতে পাই—সমাজে যাঁরা

বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, তাঁদের ভেতর যখন দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়, তখন সমাজের সকল স্তরের লোকের মধ্যেই এই দুর্নীতি পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। তখন জনসাধারণ যে শুধু আদর্শ থেকেই ভ্রষ্ট হয় তাই নয়, আদর্শের প্রতিও তারা শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ে। দেশে চরম নৈতিক সঙ্কট তখনই উপস্থিত হয়, যখন সমাজে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত লোকেরা বা ধনী ব্যক্তিরা দণ্ডের হাত থেকে অব্যাহতি পান। লোকে কথায় বলে, 'রুই কাতলা খালাস পায়, চুনো পুঁটির প্রাণ যায়'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কোনও কর্তব্য নেই, আমার অপ্রাপ্তও কিছু নেই, প্রাপ্তব্যও কিছু নেই, তথাপি আমি অনুক্ষণ কর্মে নিযুক্ত রয়েছি। আমি যদি অতন্দ্রিত হয়ে সর্বদা কর্মে নিযুক্ত না থাকি, তবে লোকে সর্বপ্রকারে আমার অনুসরণ করবে। আমি যদি কর্ম না করি, তবে লোকসকল নষ্ট হবে। আমি বর্ণসাঙ্কর্যের বা সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ হব, এবং এই প্রজাকুলেরও নাশের হেতু হব।' এর পরেই তিনি বলছেন—'হে ভারত, অজ্ঞান ব্যক্তিরা যেমন আসক্ত হয়ে কর্ম করে, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও আসক্তি ত্যাগ করে লোক-কল্যাণের জন্য বা লোকের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য কর্ম করা উচিত।' ইংরাজিতে একটা কথা আছে—'Example is better than precept', অর্থাৎ অপরকে উপদেশ দেওয়ার চাইতে অপরের নিকট দৃষ্টান্ত স্থাপন করা ভাল। পরোপদেশে পাণ্ডিত্য আজকাল অনেকের মধ্যেই দেখা যায়, কিন্তু যাঁরা বড় বড় বুলি কপচান, তাঁরা ভুলে যান যে 'আপনি না কৈলে ধর্ম শেখান না যায়'। শাস্ত্রের উপদেশকে যাঁরা জীবনে প্রতিফলিত করেন, শুধু তাঁরাই আচার্য হতে পারেন, তাঁদের মুখে যা উচ্চারিত হয়, তাই বাণী হয়ে ওঠে। ভারতের প্রাচীন পণ্ডিত বলেছেন—

'শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ
যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্।'

শাস্ত্র পাঠ করেও মানুষ মূর্খ হতে পারে, যিনি ক্রিয়াবান পুরুষ, অর্থাৎ শাস্ত্রকে যিনি দৈনন্দিন জীবনে চর্যার ভেতর দিয়ে সার্থক করে তোলেন, তিনিই পণ্ডিত। একটি দীপশিখা থেকেই হাজার হাজার দীপশিখা জ্বলে ওঠে (প্রবর্তিত দীপ ইব প্রদীপাৎ), যিনি স্বয়ং অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত, তিনিই অপরকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারেন। তাই একজন ইংরেজ কবি বলেছেন—

'As one lamp lights another, nor grows less,
So nobleness enkindleth nobleness.'

অবশ্য, মানুষের সঙ্গে মানুষের রুচিগত, প্রকৃতিগত ও শক্তিগত পার্থক্য আছে। যিনি চক্ষুষ্মান, তিনি এই পার্থক্যকে অস্বীকার করতে পারেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, 'জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজের প্রকৃতি অনুসারে চলেন। ভূতসমূহ নিজের প্রকৃতির অনুসরণ করে, নিগ্রহ বা বলপ্রয়োগ কি করতে পারে?'

'সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

—গীতা ৩।৩৩

তাই বলে মানুষ কি অন্ধভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে? তা হলে তো মানুষকে পশুর স্তরে নেমে যেতে হবে। মানুষ প্রকৃতির অনুসরণ করেও ধীরে ধীরে প্রকৃতিকে অতিক্রম করবে।

যিনি যথাশক্তি লোক-সংগ্রহের জন্যে কর্ম করেন, তিনিই আমাদের বরণীয়। রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট কবিতা সকলেরই স্মরণ রাখা দরকার।—

'কে লইবে মোর কার্য? কহে সন্ধ্যারবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি॥
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামি,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি॥'

—কণিকা

যিনি অতন্দ্রিত ভাবে যথাশক্তি লোক-কল্যাণের জন্য কর্ম করেন, তিনিই ধন্য। কিন্তু যতক্ষণ আমাদের মনে ফলের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ আমরা সিদ্ধিলাভে উল্লসিত হই, আবার অসিদ্ধিতে বিচলিত হই। এই জন্য শ্রীভগবান বলেছেন, লাভ ও অলাভে, জয় ও পরাজয়ে সমবুদ্ধি হয়ে, আমাতে কর্মফল অর্পণ করে কর্তব্যবোধে কর্ম করে যাও। একেই বলে যোগস্থ হয়ে কর্ম করা। এটা অবশ্য আদর্শের কথা। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও একজন প্রসিদ্ধ কবির কণ্ঠেও আমরা শ্রীভগবানের বাণীর অস্ফুট প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। আমরা জার্মান দার্শনিক ইম্যানুয়েল ক্যাণ্ট ও ইংরেজ কবি টেনিসনের কথা বলছি।

দার্শনিক ক্যান্ট চরিত্র-নীতির যে আদর্শ স্থাপন করেছেন, তার সঙ্গে কর্মযোগের আদর্শের মৌলিক পার্থক্য আছে। মানুষের প্রকৃতিভেদে বা অধিকারভেদে কর্ম যে বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, সে কথা ক্যান্ট স্বীকার করেননি। তবু তাঁর কণ্ঠে গীতার বাণীর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তিনি বলেছেন—মানুষ কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই কর্তব্য কর্ম করবে, কোনও অনুভূতির বশীভূত হয়ে বা কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর অধীন হয়ে কর্ম করবে না, আর তাকে সম্পূর্ণরূপেই ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হবে। ক্যান্ট অবশ্য যোগযুক্ত কর্মের কথা বলেননি, মানুষের বিচারবুদ্ধির ওপরেই তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ক্যান্টের আদর্শ হচ্ছে Duty for duty's sake। তিনিও গীতার সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারতেন—

'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

—গীতা ২।৪৭

কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে তোমার অধিকার নেই।

ইংরেজ কবি টেনিসনও আকাঙ্ক্ষার কথা চিন্তা না করে সত্যের অনুসরণ করতে বলেছেন। তিনি বলেন—নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবান হবে, আত্মজ্ঞান লাভ করবে, আর আত্মসংযম অভ্যাস করবে। (আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মজ্ঞান ও আত্মসংযম, এ তিনটি গুণ মানুষকে একচ্ছত্র শক্তির অধিকারী করে) তবু শক্তির কামনা নয়, শক্তি তো অযাচিত ভাবেই আমাদের কাছে আসবে, ন্যায়বর্ত্মের অনুসরণ করাই হচ্ছে মুখ্য কথা। যাকে ঋত বা সত্য বলে, তা চিরদিনই ঋত বা সত্য, সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে সত্যের অনুবর্তন করাই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ। টেনিসনের একটি বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি প্রসিদ্ধ পঙ্‌ক্তি আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি—

('Self-reverence, self-knowledge, self-control
These three alone lead life to sovereign power)
Yet not for power, (power of herself
Would come uncalled for), but to live by law,
Acting by law, we live by without fear.
And because right is right, to follow right,
Is wisdom in the scorn of consequence.'

কিন্তু এ কথা আমাদের সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে যে, লোক-সংগ্রহের উপায়—দৃষ্টান্ত-স্থাপন, বল-প্রয়োগ বা কৌশল নয়। যাঁরা পরহিতব্রতধারী, তাঁরাই লোক-সংগ্রহের অধিকারী। বর্তমান যুগে আমরা দেখতে পাই, কোন কোন রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয় না, সেখানে ব্যক্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্রমাত্র, শিক্ষাব্যবস্থাও সেখানে একটি বিশেষ লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এই ধরনের রাষ্ট্রকে বলে totalitarian state। এরূপ রাষ্ট্রে যা ঘটে থাকে, তা লোক-সংগ্রহ নয়, তা হচ্ছে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তির বলিদান, মানুষের রুচিভেদ ও প্রকৃতিভেদকে অস্বীকার, মানুষের প্রকৃতি-নিয়ত কর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা। দার্শনিক-প্রবর ক্যাণ্ট বলেছেন, প্রকৃতি অমোঘ নিয়মের অধীন, কিন্তু মানুষ তার নিজের জীবনের নিয়ন্তা, প্রত্যেক মানুষই স্বরাট্। এই জন্য কোন মানুষকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র করে রেখো না। (Always treat humanity, both in thine own person, as well as in the persons of others, always as an end, never merely as a means.) প্রত্যেক মানুষেরই পরিপূর্ণ আত্ম-বিকাশের জন্য চিন্তা, কর্ম ও বাক্যের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন, কিন্তু আবার সমাজের অধীন প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতাই সীমাবদ্ধ। তাই সমষ্টিগত কল্যাণ যাতে ব্যাহত হয়, এমন কোন কর্ম করার অধিকার কারও নেই। ব্যাপক অর্থে চিন্তা করাটাও কর্ম, আবার কথা বলাটাও কর্ম। আমরা অনেক সময় মনে করি, আমরাই একমাত্র সত্য পথে চলেছি, আমরাই একমাত্র সত্যধর্মকে আশ্রয় করেছি, তাই আমাদের মতটা অপরে গ্রহণ করুক, আমাদের পথ অপরে আশ্রয় করুক এটাই আমরা মনেপ্রাণে কামনা করি। এরূপ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির মূলে থাকে অজ্ঞান।

ইংরেজীতে toleration নামে একটা কথা আছে, আমরা তার বাংলা তর্জমা করি 'পরমত-সহিষ্ণুতা'। এ যুগে আমরা আবার peaceful co-existence বা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলে থাকি। এ কালে আমরা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করি—পরমত-সহিষ্ণুতাই হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-নীতির ভিত্তি। কিন্তু অপরের মতের প্রতি সহনশীলতা অনেক সময়েই একটা গোঁজামিল মাত্র, এতে অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বোঝায় না, এমন কি, অপরের মতের প্রতি মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ করেও মানুষ বাইরে এরূপ সহনশীলতা দেখাতে পারে। পরমত বা পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ভারতীয়

সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জৈনদর্শনেও একথা বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি বিষয় নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যায়। তাই দুটি পরস্পরবিরোধী মতও সমান সত্য হতে পারে। সত্যের সামগ্রিক রূপ আমরা দেখতে পাইনে, আমাদের প্রত্যক্ষকে তাই অন্ধের হস্তিদর্শনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আবার সত্য যে শুধু শ্রীভগবানের অনুগৃহীত বা প্রেরিত কোন পুরুষের ভেতর দিয়েই প্রকাশিত হয় বা কোন বিশেষ জাতির ওপরেই তাঁর প্রসাদ বিশেষরূপে বর্ষিত হয়, ভারতের কোন ধর্মগুরুই এ কথা বলেননি। তাঁরা বলেন, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে বা নরনারী-নির্বিশেষে প্রত্যেকেই তীব্র সাধনা ও তপশ্চর্যার দ্বারা সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারেন। বাংলাদেশের একজন অতি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও মনস্বী পুরুষ বলেছেন, 'স্বর্গরাজ্য জেলখানা নয় যে তার একটি মাত্র দ্বার থাকবে'। এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে এক বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ভারতবর্ষে যে সমস্ত ধর্মের উদ্ভব হয়েছে, সেই সব ধর্ম মানুষকে আত্মোপলব্ধির অধিকার দিয়েছে। ভারতের কোন ধর্মগুরুই এ কথা বলেননি যে, তোমরা নির্বিচারে আমার বাণীর অনুসরণ করো, কেননা, ভগবানের বাণী আমার ভেতর দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে। ভগবান তথাগত মহা-পরিনির্বাণ লাভের পূর্বে প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন—'আত্মদীপ হয়ে বিহার কর, অনন্যশরণ হয়ে বিহার কর, ধর্মদীপ হয়ে বিহার কর, ধর্মশরণ হয়ে বিহার কর।' ভারতবর্ষ মানুষকে চিন্তার স্বাধীনতা দিয়েছে আর য়ুরোপ দিয়েছে কর্মের স্বাধীনতা—বাংলার দুজন মনস্বী সন্তান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। ভারতবর্ষ মানুষকে চিন্তার স্বাধীনতা দিয়েছে বলেই ভারতে আস্তিক ও নাস্তিক কত রকমের দর্শনের আবির্ভাব ঘটেছে। এ দেশের ঋষি ও মনীষিগণ উপলব্ধি করেছেন—আমার মতবাদ বা বিশ্বাস যদি আমি অপরের ওপর চাপিয়ে দিই, তা হলে তার আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তাঁরা মানুষকে আহার-বিহারাদির স্বাধীনতা দেননি, কারণ, তাঁরা জানতেন, মানুষ কর্মে স্বাধীন হলে সমাজে অসংযম বা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় পাবে। সুতরাং যারা ব্যক্তিগত, দলগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপর লোককে ছলে বলে বা কৌশলে নিজের পক্ষে আনয়ন করে, অপর মানুষের ব্যক্তিসত্তার যারা মর্যাদা দেয় না, তারা দেশের ও সমাজের শত্রু—তাদের প্রয়াস যদি সিদ্ধিলাভ করে, তবু তাদের কর্মকে 'লোক-সংগ্রহ' বলা চলে না। যাঁরা

(লোক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের সর্বপ্রথম 'মানুষের মত মানুষ' হতে হবে, অপরের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে) আধুনিক কালে স্বার্থান্ধ লোকেরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য 'দল ভারী' করেন, অথবা 'বিবেকান্ধ' লোকদের ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত করে তাদের দারুণ কর্মে প্ররোচিত করেন। লোক-সংগ্রহের আদর্শ স্বার্থান্ধ লোকদের জন্য নয়, যাঁরা লোক-কল্যাণের ব্রত ধারণ করেছেন, তাঁদেরই জন্য। যাঁরা আচারবান, ধর্মকে যাঁরা চর্যার ভেতর দিয়ে জীবনে সার্থক করে তুলেছেন, অথচ যাঁদের মন ধর্মান্ধতার সংস্কার থেকে মুক্ত, তাঁরাই প্রচারের ব্রত গ্রহণ করতে পারেন।

আমরা জানি, ব্যষ্টির কল্যাণের সঙ্গে সমষ্টির কল্যাণের কোন বিরোধ নেই। যে মানুষ শুধু নিজের পরম কল্যাণ বা মুক্তির কথা চিন্তা করে, সেও স্বার্থপর। সমাজের প্রতি প্রত্যেক নরনারীরই একটা কর্তব্য আছে। এইজন্য যে সত্য আমি জীবনে উপলব্ধি করেছি, সেই সত্যের আলোকে অপরের জীবনকে উদ্দীপ্ত করা, যে অমৃত আমি নিজে আস্বাদন করেছি, সেই অমৃত অপরের মধ্যে অকৃপণ ভাবে পরিবেশন করা আমার জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। আর এই ব্রতের আচরণের দ্বারাই লোক-সংগ্রহ হয়। প্রাচীন ভারতেও অনেকে লোকল্যাণার্থেই প্রচার-ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। বৈদিক ভারতে ছিল অনার্যদের আর্যীকরণ, এই আর্যীকরণের ভেতর দিয়েই আর্যেতর জাতিসমূহ নতুন সংস্কার লাভ করেছেন। ভগবান তথাগত নির্বাণলাভের পর দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বর্ষকাল লোক-কল্যাণ বা লোক-সংগ্রহের জন্যই কর্ম করেছেন। আচার্য শঙ্কর মায়াবাদী সন্ন্যাসী হলেও তাঁর কর্মশক্তি ও সংগঠনশক্তি ছিল অসাধারণ, দিগ্বিজয় ও মঠ-প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়েই তিনি লোক-সংগ্রহ করেছিলেন ও সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রেমের যে বন্যা প্রবাহিত করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। তাঁর অগণিত পরিকরেরা তাঁর দিব্য জীবন ও বাণী নিভৃত পল্লীর দীনতম মানুষের কাছেও পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন, আর সে যুগে বহু প্রতিভাবান পদকর্তা ও বিদগ্ধ জনের সাধনার ফলে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য যুগপৎ অসাধারণ শ্রীসম্পন্ন হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলায় লোক-সংগ্রহের জন্য কী বিরাট আয়োজনই না হয়েছিল!

যাঁরা আপন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অপরকে শ্রেয়ের পথে চালিত করেন

তাঁরাও লোক-সংগ্রহ করে থাকেন। (এ কালে স্বামিজী, নেতাজী প্রভৃতি মনীষিগণ লোক-সংগ্রহের যে আদর্শ রেখে গেছেন, তার মূলে ছিল তাঁদের বলিষ্ঠ চরিত্রের প্রভাব)

আমরা পূর্বেই বলেছি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম-সংস্থাপন করেছেন, তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : তিনি বৈদিক কর্মকাণ্ডকে বা প্রচলিত বর্ণাশ্রম-ধর্মকে আঘাত করেননি। যাগযজ্ঞাদি কর্মকে কেমন করে অন্তর্মুখী করতে হয়, তারই পথ তিনি প্রদর্শন করেছেন। আবার গুণগত চাতুর্বর্ণ্যকে স্বীকার করেও (বংশগত নয়) তিনি সর্বমানবের জন্য, এমন কি সুদুরাচার ব্যক্তির জন্যও পরম আশা ও আশ্বাসের বাণী উচ্চারণ করেছেন। রুচিভেদে ও প্রকৃতিভেদে মানুষের উপাসনা-পদ্ধতির ভিন্নতা স্বীকার করেও তিনি বলেছেন—'যে আমারে ভজে যৈছে তারে ভজি তৈছে।'* ('যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।') তাই আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে এ কথা বলতে পারি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধু শ্রেষ্ঠ ধর্ম-সংস্থাপক নন, লোক-সংগ্রহের আদর্শও তিনি স্থাপন করেছেন।

৬

আমরা ছেলেবেলায় শুনেছি—'ভূ' ধাতু আর 'কৃ' ধাতুর রূপ যার কণ্ঠস্থ আছে, সংস্কৃতে কোন বাক্যরচনার সময় ক্রিয়াপদের জন্য তাকে ভাবতে হয় না। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি পৃথিবীর সকল শাস্ত্রের সমস্ত অনুশাসনের সারমর্ম এই দুটি ধাতুর মধ্যে নিহিত আছে। সংসার কর্মক্ষেত্র বটে কিন্তু যন্ত্রের মত অবিরত শুধু খেটে খেটে নিজেকে ক্ষয় করে দেওয়াই জীবনের লক্ষ্য নয়, অতন্দ্রিত কর্মসাধনার মূলে থাকবে পূর্ণতা-লাভের ও লোক-সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা। এই যে লোক-সংগ্রহের বাসনা, এরও মূলে আছে সমাজচেতনা। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, করাটা হচ্ছে উপায় আর হওয়াটা হচ্ছে উদ্দেশ্য। (পূর্ণ হওয়া বা পরিপূর্ণতা লাভ করার ভেতরেই জীবনের সার্থকতা) মহাপুরুষ যীশুও বলেছেন—Be ye perfect as your Father which is in Heaven is perfect. এই পূর্ণতা যাকে বলি, তারই অপর নাম নিঃশ্রেয়স্, কৈবল্য, মুক্তি প্রভৃতি। শ্রীভগবান বলেছেন, এই নিঃশ্রেয়স্ বা কৈবল্য লাভ করেও মানুষ

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

লোক-সংগ্রহের জন্য কর্ম করতে পারে। যাঁরা সর্ববন্ধনমুক্ত হয়েও লোক-সংগ্রহের জন্য বন্ধনকে বরণ করে নেন, সেই অনাসক্ত কর্ম-যোগীরাই ধন্য।

ভারতবর্ষ শুধু নৈরাশ্য ও শুষ্ক বৈরাগ্যের বাণীই প্রচার করেনি, ভারতের বাণী হচ্ছে—'মা ভৈষীঃ', তোমাদের ভয় নেই, কারণ, তোমাদের অন্তরে সুপ্ত রয়েছে অনন্ত শক্তি, তাই তোমরা সবাই পূর্ণতালাভের—মুক্তি, অপবর্গ বা কৈবল্যলাভের অধিকারী। ভারতবর্ষ কখনও এ কথা বলেনি যে সত্য বা ধর্ম শুধু শ্রীভগবানের অনুগৃহীত ব্যক্তিবিশেষের নিকট প্রকাশিত হয়, তাঁর ক্রিয়াকলাপ সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য (Mysterious are the ways of Providence). (ভারত কখনও বলেনি যে যুক্তিতর্কের আশ্রয় না নিয়ে অন্ধভাবে শাস্ত্রবচনের অনুসরণ করাই ভাল, কারণ যাঁরা বিশ্বাসী, শুধু তাঁরাই পরিত্রাণ লাভ করবেন, স্বর্গরাজ্যের দ্বার তাঁদের কাছেই উন্মুক্ত হবে। বৃহস্পতি বলেছেন—'কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করে কর্তব্য নির্ণয় করবে না, কারণ, যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি ঘটে থাকে।'

'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥')

ভারতের সকল দর্শনেরই সিদ্ধান্ত এই যে অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ, আর জ্ঞানই হচ্ছে মুক্তির উপায়। গায়ত্রী-মন্ত্রেও বলা হয়েছে—'যিনি আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণ করেন' ইত্যাদি।

আমাদের দর্শনশাস্ত্রে যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার। আমরা দেখেছি, গীতায় শ্রীভগবান আমাদের স্বধর্মের অনুসরণ করতে অর্থাৎ প্রকৃতিনির্দিষ্ট কর্ম করতে বলেছেন, কারণ, এরূপ কর্মের দ্বারাই নিজের ও জগতের কল্যাণ হয়। কর্মযোগের আরও দুটি মূলসূত্র এই—১. (স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে আমাদের শুধু যজ্ঞার্থে অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রীতির জন্য কর্ম করতে হবে। আমাদের জীবনের সকল কর্মকেই যজ্ঞে পরিণত করতে হবে। ২. আমাদের কর্ম করতে হবে লোক-সংগ্রহ বা লোকশিক্ষার জন্য)। এ ভাবে অনাসক্ত হয়ে যদি প্রতিটি করণীয় কর্ম সম্পাদন করা যায়, তাহলে সে কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না এবং পরিণামে সেই কর্মের দ্বারাই আমরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারি। আর এই জ্ঞান লাভ করলেই আমরা সকল পাপ থেকে

মুক্ত হই। এরূপ জ্ঞানী বা তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা যেখানে সমাজ বা রাষ্ট্রের নায়ক, সেখানেই আদর্শ সমাজ বা আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। প্লেটোর পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রেও একমাত্র তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণই রাজ্যশাসনের অধিকারী। ভারতবর্ষে যখন ক্ষত্রিয় রাজারা রাজ্য শাসন করতেন, দুর্বৃত্তের দমন ও শিষ্টের পালন করতেন, তখনও ঋষিগণের নির্দেশ অনুসারেই তাঁদের চলতে হত। রাজাকে কোন্ কোন্ গুণের অধিকারী হতে হবে এবং কি ভাবে জীবন যাপন করতে হবে, সে বিষয়েও ভারতীয় অর্থশাস্ত্রে বিশদ আলোচনা রয়েছে। ভারতবর্ষে ক্ষাত্রধর্মের আদর্শ কি ছিল মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের কয়েকটি শ্লোকে তা বিবৃত করেছেন।

ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। কোন্ কর্ম করা উচিত, আর কোন্ কর্ম করা উচিত নয়, সে বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধিও অনেক সময়ে বিভ্রান্ত হয়। তথাপি তত্ত্বজ্ঞানের আলোকেই স্বধর্মের অনুসরণ করতে হবে, স্ব স্ব কর্ম নির্ণয় করতে হবে। একের পক্ষে যাহা স্বধর্ম, অপরের পক্ষে সেটা পরধর্ম হতে পারে। সমাজদর্শনে বলা হয়, সেই সমাজ হচ্ছে আদর্শ সমাজ যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ পায়, প্রত্যেকে যেখানে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য তো গুণগত, রীতিগত ও প্রকৃতিগত। এই নৈসর্গিক বৈষম্য থেকেই মানুষে মানুষে শ্রেণীবিভাগ ঘটে। (যে সমাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা হয় না বা মানুষ আপন রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী বৃত্তি নিরূপণ করতে পারে না, সে সমাজ আদর্শ সমাজ নয়) আপনি হয়ত সঙ্গীতে বা চিত্রবিদ্যায় অনুরাগী কিন্তু নিতান্তই 'দগ্ধ উদরের জন্য' বা পোষ্যবর্গের পালনের জন্য আপনাকে পুলিস-বিভাগে প্রবেশ করতে হয়েছে কিংবা ওকালতি করতে হচ্ছে, এটা কি একটা মস্ত বিড়ম্বনা নয়? গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন—'পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন তিন গুণ থেকে মুক্ত; শুধু পৃথিবীতে কেন, স্বর্গে দেবতাদের মধ্যেও এমন কেউ নেই।'

'ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥'

—গীতা ১৮।৪০

শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু যথার্থ সাম্যবাদের বিরোধী নন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয় সাম্যবাদের প্রবক্তা। এ সাম্যবাদ ভল্টেয়ার, রুশো প্রভৃতি ফরাসী পণ্ডিতগণের সাম্যবাদও নয়, বিপ্লবী চিন্তানায়ক কার্ল মার্কসের শ্রেণীহীন সমাজ বা সমভোগবাদও নয়, এ সাম্যবাদের মূল কথা মানুষে মানুষে পার্থক্য পরিমাণগত, গুণগত নয় ; একে ইংরাজীতে বলা যায় potential equality of all men. জৈনদর্শনেও এই সাম্যবাদ স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই সাম্যবাদ মানুষে মানুষে নৈসর্গিক বৈষম্য স্বীকার করে, প্রত্যেক মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে মেনে নেয়। মনস্বী প্লেটো মানুষের রুচিগত বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ওপর কিছু বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর রচিত 'রিপাব্লিকে' দেখতে পাই—সক্রেটিস বলেছেন, আদর্শ রাষ্ট্রে অভিনয়ের কোন স্থান থাকা উচিত নয়, কেননা, অভিনেতাকে বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় করতে হয়। কিন্তু সংসারটা যদি রঙ্গমঞ্চ হয়, তবে সে রঙ্গমঞ্চে আমাদের শুধু একটিমাত্র চরিত্রেরই অভিনয় করতে হবে, আমাদের ভেতর যে শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তাকে বিকশিত করে তুলতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, প্রতিটি মানুষকে উত্তম নাগরিকরূপে গড়ে তোলা) আদর্শ রাষ্ট্রে প্রত্যেকেই যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে, আর এইজন্যেই আমাদের শক্তিকে একটি লক্ষ্যের দিকে কেন্দ্রীভূত করা দরকার। এইজন্যে এই জীবন-রঙ্গমঞ্চে একটিমাত্র 'ভূমিকায় অবতীর্ণ' হতে হবে। প্লেটোর আদর্শ সমাজে কেউ হবেন স্থিতধী দার্শনিক, রাজ্য-শাসনের ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত থাকবে, কেউ দেশকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ও দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য সেনাদলে যোগদান করবেন, আবার কেউ-বা দেশের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির জন্য কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করবেন। একজন অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবেন না। এইখানেই শ্রমবিভাগের (Division of Labour) সার্থকতা। প্লেটো যে আদর্শ সমাজের পরিকল্পনা করেছেন, তা ভারতীয় সমাজের মতই স্তর-বিন্যস্ত (hierarchical)। কিন্তু যে দার্শনিক ভিত্তির ওপর ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, তা শুধু ভারতেরই বৈশিষ্ট্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন,—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।'

—গীতা ৪।১৩

গুণ ও কর্মের বিভাগ করে আমি চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছি।

মানুষের ভেতর যে প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য আছে, একথা তো অস্বীকার করা যায় না। আর এই প্রকৃতির ভেদকে স্বীকার করে নিলে কর্মের ভেদ, বৃত্তির ভেদ এবং অধিকারের ভেদকেও স্বীকাব করে নিতে হবে। কিন্তু একথাও সত্য যে,(প্রত্যেকটি মানুষ স্ব স্ব প্রকৃতিব অনুসরণ করেই ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারে)। আর্য ঋষিগণ যে দ্বিজাতির জন্য চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা করেছিলেন, তারও উদ্দেশ্য ছিল—জীবনে পরিপূর্ণতাকে লাভ করা অথবা আমাদের অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে ধীরে ধীবে প্রকটিত করা। শ্রীভগবান অবশ্য গীতায় এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের কথা বলেননি। তন্ত্রশাস্ত্রেও বলা হয়েছে ক্রমমুক্তির কথা। তন্ত্র বলেন, আমাদের মধ্যে যেমন অধিকারের ভেদ আছে, তেমনই আচারের ভেদও আছে। সংসাবে কেউ তামসপ্রকৃতি, কেউ রাজসপ্রকৃতি, কেউ বা সাত্ত্বিকপ্রকৃতি; তাই আচাবও তিন রকমের—পশ্বাচার, বীরাচার ও দেবাচাব। অবশ্য দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মুক্তি লাভ করাই মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য। ভারতীয় সমাজদর্শনের মূল ভিত্তিও তাই। আমাদের আদর্শ অবশ্য খুব বড়, স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী হওয়া, যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা। তপস্যা বা সাধনার দ্বারাই মানুষকে গুণ অর্জন করতে হয়। তপস্যার প্রভাবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারে, আবার তপস্যার অভাবে ব্রাহ্মণও শূদ্র হতে পারে। গীতায় ভগবান নৈসর্গিক চাতুর্বর্ণ্যের কথাই বলেছেন, বংশগত চাতুর্বর্ণ্যের কথা বলেননি। অবশ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মানুষের জীবনে বংশের প্রভাবকেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। ব্রাহ্মণত্বই আমাদের জীবনের লক্ষ্য, তাই বলা হয়েছে—

'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাৎ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্মং জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥'

মানুষ শূদ্র হয়েই জন্মে, উপনয়ন-সংস্কার হলেই তাকে বলে দ্বিজ, বেদাধ্যয়ন করলেই তিনি হন বিপ্র, আর যখন ব্রহ্মকে জানেন, তখনই তিনি হন ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণও যে বেদ পাঠ না করে অন্য বিষয়ে শ্রম করলে অচিরকালের মধ্যে সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন, সে কথাও ভগবান মনু বলেছেন। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্বিধারহিত। তিনি বলেছেন—

'যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদান্ অন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বং আশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ'॥

—মনুসংহিতা ২।১৬৮

অবশ্য, জাতিভেদপ্রথা যখন সম্পূর্ণ বংশগত হয়ে দাঁড়াল, মানুষে মানুষে যখন কৃত্রিম ব্যবধান রচিত হ'ল, তখন এটাই হয়ে দাঁড়াল একটা মস্তবড় অভিশাপ। কিন্তু একথাও সত্য যে চাতুর্বর্ণ্য ও চতুরাশ্রমের ভেতরেই রয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্টতা। এইসঙ্গে চতুর্বর্গ বা চারটি পুরুষার্থের কথাও চিন্তা করা দরকার। এই চারটি পুরুষার্থ হচ্ছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। পরে দেখব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে এই চারটি বর্গের ভেতরে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন—'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্মসকল বিভক্ত হয়ে গেছে, আর এই বিভাগের কারণ হচ্ছে স্বভাবজ গুণ'। (মানুষের মধ্যে কারও ভেতর রয়েছে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, স্বভাবতঃই এঁরা লোভশূন্য ও বিষয়ে অনাসক্ত, এঁরা মননশীল ও জ্ঞানী, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই এঁদের ব্রত, এঁরা যে জাতির মধ্যেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, এঁরা ব্রাহ্মণ) ম্যাক্সমূলার, পল্ ডয়সেন, স্যার উইলিয়াম জোন্স বা বিচারপতি উড্রফ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, সে বিষয়ে আর সংশয় কি? (যাঁদের ভেতর সত্ত্ব ও রজোগুণ প্রবল, তাঁরাই হচ্ছেন ক্ষত্রিয়) যে সব অত্যাচারী বা স্বৈরাচারী নরপিশাচ অকারণে (ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য নয়) পৃথিবীকে নররক্তে প্লাবিত করে, তারা ক্ষত্রিয় নয়। চেঙ্গিজ খাঁ, নাদির শাহ, তৈমুর লঙ্গ, হিটলার বা মুসোলিনী ক্ষত্রিয় নন, তাঁরা রক্তপিপাসু দানবমাত্র। এ যুগে যথার্থ ক্ষাত্রশক্তির এক অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভেতর। (যাঁদের ভেতর রজোগুণ আর তমোগুণ প্রবল, তাঁরাই হচ্ছেন বৈশ্য) যাদের বলা হয় মুনাফাশিকারী বা চোরাকারবারী, যাদের ভেতর সমাজচেতনার বা মানবতার একান্ত অভাব, তারা বৈশ্য নয়, তারা অপরাধী, তারা রাজদ্বারে দণ্ডনীয়। (যাদের ভেতর তমোগুণ প্রধান, তারা নেতা হতে বা কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে না; কিন্তু তারা যদি পরিচর্যা বা সেবাকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করে, তবে তারাই হবে শূদ্র) গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

'শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥
কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥'

—গীতা ১৮।৪২।৪৪

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিকতা—এ সকল ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ। (অথবা এ সকল যাঁর স্বভাবসিদ্ধ, তিনিই ব্রাহ্মণ।) শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান, প্রভুত্ব—এ সকল ক্ষত্রিয়ের স্বভাবসিদ্ধ। কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য—এ সকল বৈশ্যের স্বভাবসিদ্ধ, আর অপরের পরিচর্যা বা সেবাই হচ্ছে শূদ্রের পক্ষে স্বাভাবিক কর্ম। লক্ষ্য করার বিষয়, মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে শূদ্র মানুষের মর্যাদা লাভ করেনি, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক বর্ণকেই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এক হিসাবে দেখতে গেলে যিনি স্বেচ্ছায় সেবার ব্রত গ্রহণ করেছেন, তিনিই শূদ্র—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মত এই শূদ্রেরাও সমাজের স্থিতিবিধান করেছেন; তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক বর্ণকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৭

প্রত্যেক মানুষেরই দুটি সত্তা আছে, একটি তার ব্যক্তিসত্তা আর একটি তার সামাজিক সত্তা। মানুষের জীবনের লক্ষ্যও দ্বিবিধ—ব্যক্তিজীবনে পূর্ণতালাভ ও সমাজের কল্যাণ-সাধন। যাদের ভেতর সমাজচেতনা অবিকশিত, যারা আত্মকেন্দ্রিক অথবা যাদের চিন্তা কখনও পরিবার-পরিজনের গণ্ডিকে অতিক্রম করতে পারে না, তাদের ভেতরেই নানা রকমের অপরাধ-প্রবণতা দেখা যায়। সমাজরক্ষার জন্যই এদের দণ্ডবিধান করা কর্তব্য।

(স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রাচীন ভারত মানুষকে চিন্তার স্বাধীনতা দিয়েছিল, কর্মের স্বাধীনতা দেয়নি, আর য়ুরোপ মানুষকে কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছিল, চিন্তার স্বাধীনতা দেয়নি) প্রাচীন সাহিত্যের 'কাদম্বরী-চিত্রে' রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ উক্তি করেছেন। ভারতবর্ষ মানুষকে কর্মের স্বাধীনতা

দেয়নি কেন? কারণ, মানুষ যদি কর্মে স্বাধীন বা স্বেচ্ছাচারী হয়, তবে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেবে, বর্ণ-সাঙ্কর্য প্রশ্রয় পাবে। তাই প্রাচীন শাস্ত্রে এমন বিধান পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে—

'যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞঃ পর্বতলঙ্ঘনক্ষমঃ।
তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ॥'

যদি ত্রিকালজ্ঞ যোগীও হও, পর্বতলঙ্ঘনেও যদি তোমার সামর্থ্য থাকে, তথাপি মনে মনেও লৌকিক আচারকে লঙ্ঘন করবে না।

আমরা মহাভারতে দেখতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম হয়েও কখনও লৌকিক আচারকে লঙ্ঘন করেননি। কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের পিসীমা, যুধিষ্ঠির ও ভীম তাঁর বড় ভাই, তাই শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই এঁদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে তিনি কখনও উন্মার্গগামী হননি, কারণ, তিনি লোকশিক্ষার জন্যই কর্ম করেছেন। কোন জিনিসেরই আতিশয্য ভাল নয়—শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের আতিশয্যও নয়। যে শাস্ত্র বা শাসন-বাক্য মানে না, সে হয় উচ্ছৃঙ্খল, আর যে 'পদে পদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষেধের ডোরে' বদ্ধ হয়ে পড়ে, সে পথ চলতে পারে না, তার অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়, অবশ্য যথার্থ শাস্ত্র আমাদের এগিয়ে চলতে সাহায্য করে। শ্রুতিও বলেন 'চরৈবেতি, চরৈবেতি' অর্থাৎ এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

আজকাল আমরা একটা কথা শুনতে পাই—মানুষের জন্যই শাস্ত্র, শাস্ত্রের জন্য মানুষ নয়; কারণ, মানুষ শাস্ত্রের চাইতেও বড়। কথাগুলো মিথ্যা নয়, কিন্তু শাস্ত্র বা অনুশাসন-বাক্য তো সমাজেরই স্থিতির জন্য, তাই মানুষ যদি শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছাচারী হয়, তবে সমাজের কল্যাণ ব্যাহত হয়। তাই বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত রেখে শাস্ত্রের অনুসরণ করতে হবে। শ্রীভগবান এই জন্যই স্বেচ্ছাচারী পুরুষের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন—

'যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥'

—গীতা ১৬।২৩

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারী হয় বা ভোগাসক্ত হয়, সে সিদ্ধি, সুখ বা পরম গতি প্রাপ্ত হয় না।

'তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥'

—গীতা ১৬।২৪

সেই হেতু, কোন্‌টা কার্য আর কোন্‌টা অকার্য, তা নির্ণয় করতে হ'লে তুমি শাস্ত্রকেই প্রমাণ বলে জানবে। শাস্ত্রের বিধান কি, তা জেনে নিয়ে তোমার কর্ম করা উচিত।

কিন্তু শ্রীভগবান্ কি আমাদের অন্ধভাবে শাস্ত্রের অনুসরণ করতে বলেছেন? তাঁর কাছে কি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বা যুক্তিবাদের কোনও মূল্য নেই? যে অন্ধভাবে শাস্ত্র মেনে চলে, তার সঙ্গে গাছ-পাথরের তফাৎ কি? যে মননশীল, তাকেই তো বলা যায় মানুষ। তা ছাড়া শাস্ত্র তো এক নয়, বহু; নানা মুনির যখন নানা মত, তখন 'কাকে নিন্দি, কাকে বন্দি', নিন্দাই বা করি কাকে, আর বন্দনাই বা করি কাকে? আর এ কথাও কি সত্যি নয় যে, এমন কোন অপকর্ম নেই, শাস্ত্রবচনের দ্বারা যার সমর্থন করা যায় না? তাই সেকস্‌পীয়ার বলেছেন—'The devil can cite scripture for his purpose' ভগবান মনুও শুধু শাস্ত্রের ওপর আমাদের নির্ভর করতে বলেননি। তাঁর মতে শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মতুষ্টি—এই চারটি হচ্ছে ধর্মের মূল। ইংরেজিতে যাকে ethos of a people বলা হয়, সেই 'জাতিগত চারিত্রিক আদর্শ'ও এই ধর্মের অন্তর্গত। আমাদের শ্রুতির অনুসরণ করতে হবে, আবার স্মৃতিরও অনুসরণ করতে হবে, তবে যেখানে শ্রুতি ও স্মৃতিতে বিরোধ রয়েছে, সেখানে অবশ্য শ্রুতিরই অনুবর্তন করতে হবে, আবার সাধুরা যে আচার পালন করেন, সেই আচার পালন করতে হবে, আর সর্বদা মনে রাখতে হবে, যাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়, তাই হচ্ছে ধর্ম।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের কর্ণপর্বে ধর্ম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। যখন যুধিষ্ঠির অর্জুনের গাণ্ডীবের নিন্দা করেছিলেন এবং অর্জুন প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্য যুধিষ্ঠিরকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, শুধু শ্রুতিতেই সকল ধর্ম উপদিষ্ট হয়নি, কিসে লোক-কল্যাণ হবে, তা ধীরভাবে চিন্তা করেই কর্তব্য নির্ণয় করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—

'শ্রুতের্ধর্ম ইতি হ্যেকে বদন্তি বহবো জনাঃ।
তত্তে ন প্রত্যসূয়ামি ন চ সর্বং বিধীয়তে ॥
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম-প্রবচনং কৃতম্।
যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥
অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্ম-প্রবচনং কৃতম্ ॥
ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎস্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥

—মহাভারত | কর্ণপর্ব ৫১।৫৪-৫৭

বহু পণ্ডিত এরূপ নির্দেশ করেন যে 'শ্রুতি থেকেই ধর্ম', তোমার সে মতের প্রতি কোন দোষারোপ আমি করিনে, কিন্তু শ্রুতিতে যে ধর্ম নির্দিষ্ট আছে, তা সকলই বিহিত নয়। ধর্মের লক্ষণ করা হয়েছে যাতে প্রাণিগণের মঙ্গল হয়, তার জন্য—যাতে প্রাণিগণের হিংসা না হয়, তার জন্যই ধর্মের লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে। অতএব যা অহিংসাযুক্ত তাই ধর্ম, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ধর্ম প্রজাসকলকে ধারণ করেন বলিয়াই ইহাকে বলা হয় ধর্ম, অতএব নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এই যে, যা ধারণসংযুক্ত তাই ধর্ম।

এখানে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে আমাদের লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, 'শ্রুতিতে যে ধর্ম নির্দিষ্ট আছে, তা সকলই বিহিত নয়'। যিনি এমন কথা বলতে পারেন, তিনি কখনও অর্জুনকে বলতে পারেন না যে, তুমি অন্ধভাবে বা গতানুগতিকভাবে শাস্ত্রের অনুসরণ কর। তিনি বরং সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন—ধর্মের একটিমাত্র লক্ষণ আছে, যা প্রজাকুলকে ধারণ করে, যার দ্বারা প্রজাকুলের মঙ্গল হয়, তাই ধর্ম; শুধু তাই নয়, যার দ্বারা সর্বভূতের হিত হয়, তাই ধর্ম। এই লক্ষণ দিয়েই আমাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কর্তব্য নির্ণয় করতে হবে। বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের দ্বারা মানুষ জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না, শ্রুতির দ্বারাও অনেক সময়ে মানুষের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়, এ সকল কথা শ্রীভগবান উদাত্তকণ্ঠে বলেছেন ভগবদ্গীতায়। বঙ্কিমচন্দ্র (তথা নবীনচন্দ্র) বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণ এই বেদপ্লাবিত দেশে প্রচার করেছিলেন 'ধর্ম বেদে নহে, ধর্ম লোকহিতে'। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—বেদে যা ধর্ম বলে উক্ত হয়েছে, তা সকলই বিহিত নয়, যাতে লোকহিত হয়, তাই ধর্ম, আর এই আদর্শের দ্বারাই ধর্মাধর্ম নির্ণয় করতে

হবে। (বেন্থাম, মিল প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলেছেন, যাতে অধিকতম লোকের প্রভূততম সুখ (greatest good of the greatest number) হয়, সেই পথেই আমাদের চলা উচিত।) বেন্থাম বা মিলের নীতিশাস্ত্রে যা আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীতেও তা রয়েছে, আবার তাঁরা যে আদর্শের কথা কল্পনাও করতে পারেননি, শ্রীকৃষ্ণ সে আদর্শও আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে: তিনি অহিংসাকে ধর্ম বলে নির্দেশ করেছেন। প্রশ্ন এই: তিনি কি অর্জুনকে হিংসাত্মক কর্মের প্রেরণা দেননি অথবা স্বয়ং দারুণ কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেননি? এর উত্তর হচ্ছে: অহিংসা পরমধর্ম, তাতে সন্দেহ নেই। যেখানে অহিংসার দ্বারা ধর্মরক্ষা করা যায়, সেখানে অহিংসারই আশ্রয় গ্রহণ করবে। কিন্তু যেখানে শুধু অহিংসার দ্বারা রাষ্ট্ররক্ষা বা ধর্মরক্ষা করা যায় না, সেখানে বলপ্রয়োগ বা হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্ররক্ষা করতে হলে প্রয়োজনমত দণ্ডনীতির প্রয়োগ করতে হবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্ররক্ষার ভার ছিল ক্ষাত্রশক্তির উপর। তাই বৃহত্তর কল্যাণের জন্য হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে ধর্ম বলে পরিগণিত হ'ত। পার্থসারথি যে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, সে শুধু ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনের জন্য, প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য নয়। রাষ্ট্রের পক্ষে যে অনেক সময়ে বল-প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, সে সম্পর্কে মনস্বী ম্যাকেঞ্জি লিখেছেন:

'It remains true that, in the end, force must be met by force and that it is among the duties of the state to protect its citizens and enforce its laws.'

সবজ্ঞ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এই রাজধর্মের কথা বিশেষ ভাবেই জানতেন। কিন্তু এখানেই তিনি থামেননি। তিনি 'অহিংসা'কে শারীরিক তপস্যা বলেছেন—

'দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥'

—গীতা ১৭।১৪

দেবদ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ (দেহের ও মনের শুচিতা), সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা হচ্ছে শারীরিক তপস্যা।

কিন্তু অহিংসা যে ত্রিবিধ—কায়িক, বাচিক ও মানসিক, এ কথাও তিনি উত্তমরূপেই জানতেন। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন, যিনি অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হন, সকল প্রাণী তাঁর প্রতি বৈরভাব পরিত্যাগ করে।

কিন্তু মানুষ বাইরে হিংসা পরিত্যাগ করলেও মনের ভেতর হিংসাকে লালন করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে অহিংসা ভীরুতা বা ক্লীবতারই নামান্তর। মহাত্মা গান্ধীও তাঁর দেশবাসীকে এ কথা বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। (স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—অহিংসা হচ্ছে সন্ন্যাসীর ধর্ম, গৃহীকে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য মাঝে মাঝে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করতেই হবে।)

কিন্তু যথার্থ ক্ষাত্রধর্মের আদর্শ যে কত বড়, তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন: 'আমি হিংসা করছি' বা 'আমি কাউকে হিংসা করিনে'—এইরূপ ধারণার মূলে রয়েছে অহংবোধ বা অজ্ঞান। এই অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। পাপ ও পুণ্য দুটোই তো বন্ধন। পাপটা হচ্ছে লোহার শিকল আর পুণ্যটা হচ্ছে সোনার শিকল। যে পাখী লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ, সেও যেমন মুক্তির আস্বাদ থেকে বঞ্চিত, যে স্বর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ, সেও তেমনি বঞ্চিত। অহংকার সর্বত্রই বন্ধনের কারণ। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠির তা পারেননি। যুধিষ্ঠিরের অহঙ্কার ছিল, 'আমি সত্যবাদী, আমি প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা বলিনে।' কর্ণেরও অহঙ্কার ছিল, পৌরুষে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তাই মহাভারতের অনেক স্থলে দেখি, কর্ণ আত্ম-প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছেন।

তর্ক উঠতে পারে: অহংবুদ্ধি বিসর্জন দেওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর কি না। সে তর্কে প্রবিষ্ট না হয়ে আমরা বলতে চাই, আমাদের আদর্শটা খুব বড় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ক্ষত্রিয়ের আদর্শ কি? শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন—

১. ক্ষত্রিয়কে প্রয়োজন হলে লোক-সংস্থিতির জন্য বা ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতেই হবে।

২. এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়কে শোকে বা মোহে অভিভূত হলে চলবে না, কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়েই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

৩. অহংবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে, অনাসক্ত হয়ে, জয়-পরাজয়ে সমবুদ্ধি হয়ে, তাকে যুদ্ধ করতে হবে। এই যুদ্ধ হচ্ছে ধর্মযুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ-কথিত এই ধর্মের

তাৎপর্য আমাদের গভীরভাবে প্রণিধান করতে হবে। এই কথাটি আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে—

'যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মঃ যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'

যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন, সেখানেই ধর্ম রয়েছেন, আর যেখানে ধর্ম রয়েছেন, পরিণামে সেখানে জয় অবশ্যম্ভাবী।

৮

আমরা মানুষের মধ্যে দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি দেখতে পাই—একটি হচ্ছে সহযোগিতার প্রবৃত্তি আর একটা প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি। সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতি নির্ভর করছে সহযোগিতার প্রবৃত্তির ওপর, পরস্পরের কল্যাণ-ভাবনার ওপর। আমাদের প্রাচীন সমাজ শ্রেণী-বিভাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু সেখানে শ্রেণী-সংঘর্ষ ছিল না। সমাজে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য ছিল, কিন্তু সে পার্থক্য কখনও মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয়নি। আমাদের জীবনযাত্রা যতদিন পল্লীকেন্দ্রিক ছিল, ততদিন পর্যন্ত ধনীর ধন বহুজনের কল্যাণে নিয়োজিত হত; সুতরাং ধনী দরিদ্রকে কৃপার চোখে দেখত না, দরিদ্রও ধনীকে ঈর্ষার চোখে দেখত না (রবীন্দ্রনাথের 'বিলাসের ফাঁস' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এ তো গেল আমাদের মধ্যযুগের সমাজ-ব্যবস্থার কথা। (অবশ্য আমাদের মধ্যযুগীয় সমাজ যে সর্বাংশে ত্রুটিহীন ছিল, এ কথা কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে না।) মহাভারতে আমরা দ্বাপর যুগের সমাজের চিত্র পাই। মনে হয়, সে সমাজে সংকীর্ণতাও ছিল, আবার উদারতাও ছিল। একলব্যের প্রতি দ্রোণাচার্যের আচরণ এ যুগে কেউ সমর্থন করবেন না। কিন্তু 'সর্প-যুধিষ্ঠির-সংবাদে' যুধিষ্ঠির দ্বিধাহীন কণ্ঠে যথার্থ ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলেছেন। সেই সব লক্ষণের অভাব ঘটলে ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়ে যায়, আবার সেই সব লক্ষণের অধিকারী হলে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেছেন—গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি করেছি, তখন তিনিও স্বাভাবিক চাতুর্বর্ণ্যের কথাই বলেছেন, বংশগত চাতুর্বর্ণ্যের কথা নয়।

যে কোন সমাজের স্থিতি ও উন্নতির মূল হচ্ছে সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মানুষের ভিতর সহযোগিতা। তাই শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ হচ্ছে—

'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমাবাপ্স্যথ ॥'

—গীতা ৩।১১

তুমি যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি বিধান কর (বা দেবতাগণকে পোষণ কর), দেবতাগণ তোমাদিগকে পোষণ করবেন। এমনি করে পরস্পরের তৃপ্তি বিধান করে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ কর।

গান্ধীজীর মতে ঈশ্বরের সৃষ্ট ভূতমাত্রেই দেবতা। তাই ভূতসেবাই হচ্ছে দেবসেবা বা যজ্ঞ।

আমাদের মনে হয়, শ্লোকটির আর একপ্রকার অর্থও অসঙ্গত নয়। ("যজ্ঞ" কথাটির অন্তর্নিহিত ভাবটি হচ্ছে ত্যাগ। কল্যাণবুদ্ধিতে যেখানে আমরা নিজের স্বার্থ বা সুখ বিসর্জন দিই, সেখানেই আমরা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। যে অপরের জন্য কিছু ত্যাগ না করে, অপরের কাছ থেকে তার কিছু গ্রহণ করার অধিকার নেই।) তাই সমাজে বিদ্যা, বুদ্ধি, পদমর্যাদা প্রভৃতিতে যাঁরা অভিজাত তাঁদেরও জনকল্যাণের কথা চিন্তা করতে হবে, আবার জনগণও নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা এঁদের পোষণ করবে। ভগবান বলেছেন, যে সমাজকে কিছু দেয় না, অথচ সমাজের কাছ থেকে গ্রহণ করে সে চোর। ঋগ্বেদেও এই ভাবের কথা রয়েছে (১০ম মণ্ডল, ১১৭ সূক্ত)। মনীষী গিরীন্দ্রশেখর তাঁর ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যায় ঋগ্বেদের উক্তির যে অনুবাদ করেছেন, আমরা তা উদ্ধৃত করছি :

'যিনি অন্নদান করেন, তাঁর সম্পূর্ণ যজ্ঞফল লাভ হয়। যিনি অপ্রচেতা অর্থাৎ যাঁর মন উদার নয়, তাঁর ভোজন মিথ্যা এবং মৃত্যুস্বরূপ। যিনি দেবতাকে দেন না, বন্ধুকে দেন না, কেবল নিজে ভোজন করেন, তাঁর কেবল পাপই ভোজন হয়।' 'কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী'।

মনস্বী লেখক কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলেছেন, যিনি অলস, যিনি অকর্মণ্য জীবন যাপন করেন, তিনি আত্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহী। সমাজের প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তি বিচিত্রভাবে মানুষের সেবা করে, এই ভাবটি প্রকাশ করতে গিয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—

'মহামানবের পূজার লাগিয়া
সবাই অর্ঘ্য চয়ন করে।'

শ্রীভগবান বলেছেন—

'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥'

—গীতা ৩।১৩

যে সাধুগণ যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হন, কিন্তু যারা শুধু নিজের জন্য পাপ করে, সেই পাপী ব্যক্তিরা পাপই ভক্ষণ করে।

আধুনিক সমাজদর্শনে যাকে আঙ্গিক মতবাদ (Organic Theory of Society) বলা হয়, তার মূল কথা হচ্ছে—মানবদেহের সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে সম্পর্ক, সমাজদেহের সঙ্গে বিভিন্ন মানুষেরও সেই সম্পর্ক। ম্যাকাইভার ও পেজ্ বলেন—

'Society's cells are individual persons, its organs and systems are associations and institutions.' (Society, p. 43)

বেদের পুরুষসূক্তে যেখানে বলা হয়েছে, ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পাদ থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উদ্ভব হয়েছে, সেখানে এই আঙ্গিক মতবাদকেই স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। মনস্বী কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলেন, ঋগ্বেদের সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ পুরুষটি হচ্ছেন দার্শনিক কোঁতের (Comte) মানব-সমষ্টি, Grand Etre বা Collective Humanity। কবি অক্ষয় বড়াল এই বিরাট পুরুষেরই বন্দনা করেছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই আঙ্গিক মতবাদকে স্বীকার করেছেন কিন্তু ব্যক্তির মহিমাকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করেননি। এইজন্য বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদিকে তিনি কোথাও প্রাধান্য দেননি। তিনি বরং পুনঃ পুনঃ এ কথাই ঘোষণা করেছেন যে যাগযজ্ঞাদির দ্বারা মানুষ জীবনে পরম মঙ্গল লাভ করতে পারে না। প্রত্যেক মানুষকে পরম মঙ্গল লাভ করতে হয় অনলস কর্মসাধনার দ্বারা, তীব্র তপস্যার দ্বারা।

আমরা বলেছি, মানুষের ভিতর যেমন সহযোগিতার প্রবৃত্তি রয়েছে, তেমনি প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তিও রয়েছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূলে আছে যশোলিপ্সা বা অর্থলিপ্সা। এ লিপ্সা রজোগুণ থেকে উৎপন্ন। অর্থলিপ্সা বা যশোলিপ্সা কিন্তু সকল ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিন্দনীয় হয়। রঘুবংশের রাজারাও 'যশসে

বিজিগীষূণাম্', যশোলাভের জন্য পররাজ্য জয় করার ইচ্ছা করতেন আবার বিজিত রাজাকে সম্মানের সঙ্গে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতেন। গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, 'মানী ব্যক্তির অপমান মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর'।

কিন্তু এই প্রতিযোগিতার অর্থ ঈর্ষা বা মাৎসর্য নয়। কুরুবংশের ধ্বংসের মূলেই ছিল পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্যোধনের ঈর্ষা। এই ঈর্ষানল যার অন্তরে প্রজ্বলিত হয়, সে নিজেও দগ্ধ হয়, অপরকেও দগ্ধ করে। মন্যুময় মহাদ্রুম দুর্যোধন তার দৃষ্টান্ত।

সমাজে যা কিছু অপরাধ সংঘটিত হয় তার মূলে রয়েছে কাম বা কামনা। এই কামনার কিছুতেই তৃপ্তি নেই। মানুষ একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই এই কামকে জয় করতে পারে।

কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করলেই তো আর নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করতে পারে না। যাঁরা বাইরে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করে মনে মনে বিষয়সম্ভোগ করেন, তাঁরা তো কপটাচারী, পাপী। বরঞ্চ, সংযত ভোগের আদর্শই সমাজে বহুজনের পক্ষে কল্যাণকর।

মানব-সমাজে কিন্তু অনেক সময় পাপের স্রোত বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় আর তখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়। ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায়, যখন কোনও দেশে অধর্ম প্রবল আকার ধারণ করে, তখনই সে দেশে কোনও মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়ে ধর্ম-সংস্থাপন করেন। সেই মহান্ পুরুষ বা লোকোত্তর পুরুষের মধ্যে শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি রয়েছে, সুতরাং তিনি শ্রীভগবানের 'তেজোঽংশসম্ভূত'।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে পার্থসারথি ভগবানের ভজনা সম্পর্কে পরম উদার ভাবের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—

'যে মানুষ যেভাবে আমার ভজনা করে, আমি সেই ভাবে তাঁর ভজনা করি অর্থাৎ তাঁর অভীষ্ট পূরণ করি।'

পৃথিবীর সমাজবিজ্ঞানীরা ধর্ম ও ধর্ম-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মানুষ ধর্মের বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য না দিয়ে ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে যতই উপলব্ধি করবে, ততই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভেতর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, আজও ধর্মান্ধতা বা সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটেনি, আজও স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক

ধুরন্ধরগণ মানুষের ভেতর ধর্মোন্মাদনা জাগিয়ে তুলে তাদের হিংস্র, বর্বর পশুতে পরিণত করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পিত আদর্শ সমাজে ধর্মান্ধতার কোনও স্থান নেই; কারণ, সেখানে মানুষের সকল কর্ম জ্ঞানের দ্বারা চালিত হয়।

(জ্ঞানের অর্থ শুধু বই পড়া নয় কিংবা কতকগুলো তথ্যের দ্বারা মস্তিষ্ককে বোঝাই করাও নয়। জ্ঞান মানে হচ্ছে আত্মোপলব্ধি। ভারতের ঋষিও বলেছেন—আত্মানং বিদ্ধি। জ্ঞানের মহিমা কীর্তন করে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলছেন—

১। জ্ঞানলাভের ফলে তোমার মোহ নষ্ট হবে।

২। তুমি যদি সর্বাপেক্ষা অধিক পাপীও হও, তথাপি জ্ঞানরূপ ভেলাকে আশ্রয় করে সকল পাপ থেকে উত্তীর্ণ হবে।

৩। পৃথিবীতে জ্ঞানের মত পবিত্র আর কিছু নেই।

৪। যিনি যোগ-সিদ্ধ, তিনি যথাকালে আপনিই জ্ঞান লাভ করেন।

৫। যিনি শ্রদ্ধাবান, একনিষ্ঠ ও ইন্দ্রিয়জয়ী, শুধু তিনিই জ্ঞান লাভ করেন। মানুষ এই জ্ঞান লাভ করে অচিরেই পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।

৬। যে অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা, সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (উপনিষদে এই বিনাশকে বলা হয়েছে মহতী বিনষ্টি।) সংশয়াত্মার না আছে ইহলোক না আছে পরলোক, আর না আছে সুখ।

৭। তোমার সংশয় অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন, তাই জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা এই সংশয়কে ছেদন কর।)

মানুষের পক্ষে প্রকৃতি-নির্দিষ্ট কর্ম করা বা স্বধর্ম আচরণ করাই এই জ্ঞানলাভের উপায়। যিনি সকল কর্মকে যজ্ঞে পরিণত করতে পারেন, তিনি পাপভাগী হন না।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে নানা রকমের যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। দ্রব্য দান করা যজ্ঞ, তপস্যা করাটা যজ্ঞ, যোগাভ্যাস অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তিগুলোকে একমুখী করার নাম অভ্যাস-যজ্ঞ, আর শাস্ত্রপাঠ ও চিন্তনের দ্বারা জ্ঞান অর্জন করাটা স্বাধ্যায়-যজ্ঞ। এক কথায় বলতে গেলে যে কর্মের দ্বারা নিজের বা অপরের হিত হয়, তাই যজ্ঞ। তাই ভূদান, শ্রমদান, বিদ্যাদান (বিদ্যা বিক্রয় নয়) এ সকলই যজ্ঞের অন্তর্গত।

শ্রীভগবান বলেছেন, জ্ঞানলাভই হচ্ছে কর্মের লক্ষ্য। এই জ্ঞান লাভ করতে হলে জিজ্ঞাসু হয়ে আচার্য বা জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে যেতে হবে। জ্ঞানলাভের অধিকার কিন্তু সকলের নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ., ডি. ফিল., ডি. লিট., প্রভৃতি উপাধি লাভ করা আর জ্ঞানী হওয়া এক কথা নয়। সংসারে জ্ঞানী ব্যক্তি দুর্লভ কিন্তু পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির অভাব নেই। যাঁর অধ্যয়ন 'তেজস্বী' হয়েছে অর্থাৎ অধীত বিষয়কে আত্মসাৎ করে যিনি চরিত্রে প্রতিফলিত করেছেন, তিনিই জ্ঞানী। যিনি শ্রদ্ধাবান, একনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয়, তিনি জ্ঞান লাভ করেন আর যিনি শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা, তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হন—শ্রীভগবানের এ কথাগুলো এ কালেও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমাদের মনে রাখতে হবে, শ্রদ্ধা মানে অন্ধ বিশ্বাস বা সংস্কারের আনুগত্য নয়। শ্রদ্ধা কথার অর্থ—লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে দৃঢ় সঙ্কল্প। এই শ্রদ্ধাই মানুষকে সর্বপ্রকার দুঃখ বরণ করতে ও প্রলোভনকে জয় করতে শিক্ষা দেয়। এই শ্রদ্ধাই বালক নচিকেতাকে আশ্রয় করেছিল। চঞ্চল-প্রকৃতি বা অসংযতেন্দ্রিয় মানুষ কখনও জ্ঞান লাভ করতে পারে না। যাঁদের আমরা জ্ঞান-তাপস বলি, তাঁরা চিত্তের একাগ্রতা সহজেই লাভ করেন, ইন্দ্রিয়জয়ের জন্যও তাঁদের পৃথকভাবে কোনও চেষ্টা করতে হয় না, কারণ তাঁদের প্রবৃত্তি স্বতঃই ঊর্ধ্বগামিনী। প্রবৃত্তির এই ঊর্ধ্বগতিকেই পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানে বলে sublimation of the libido.

৯

আমরা দেখেছি, ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, তিনি বলেছেন, এ সংসারে জ্ঞানের মত পবিত্র কিছু নেই। কিন্তু তিনি এ কথাও বলেছেন যে সংসারে যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি দুর্লভ, কাল পরিপক্ব হলেই এই জ্ঞান আমাদের অন্তরে স্ফুরিত হয়। কিন্তু তিনি কখনও এ কথা বলেননি যে এই দৃশ্যমান জগৎটা স্বপ্ন বা মায়া, এ কথাও তিনি বলেননি যে জীব আর ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নেই। শ্রীভগবানের মতে এই দৃশ্যমান জগৎটা সম্পূর্ণ সত্য, তাই প্রত্যেক মানুষকেই লোক-কল্যাণের জন্য অনাসক্ত ভাবে কর্ম করতে হবে। আত্মরক্ষা, পরিবার ও পরিজনবর্গের রক্ষা, দেশরক্ষা, রাষ্ট্ররক্ষা, স্বধর্মরক্ষা ও মানবকুলের রক্ষার জন্যই প্রত্যেক মানুষ নিরাসক্তভাবে

কর্ম করবে। যিনি এ ভাবে কর্ম করতে পারেন, তিনি গৃহে থেকেও সন্ন্যাসী) তিনি কর্মযোগী আর এই কর্মযোগীরাই জাতির আদর্শ। 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ', এ কথা সত্য নয়।

ভারতের প্রাচীন সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল তার চাতুর্বর্ণ্য ও চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা। আমরা দেখেছি, শ্রীভগবান বংশগত চাতুর্বর্ণ্য স্বীকার না করলেও গুণগত ও নৈসর্গিক চাতুর্বর্ণ্য স্বীকার করেছেন। 'আমি গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চারিটি বর্ণের সৃষ্টি করেছি' এ কথা স্বয়ং ভগবানই বলেছেন, কিন্তু তিনি কখনও এ কথা বলেননি যে আমি চতুরাশ্রমের সৃষ্টি করেছি। তথাপি এ কথা সত্য যে, ভারতের প্রাচীন আর্যসন্তানগণ এই চতুরাশ্রমের ভেতর দিয়েই ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হতেন। মহাপুরুষ যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন:

'Be ye perfect as your Father which is in Heaven is Perfect.'

তাই আর্য ঋষিগণেরও নির্দেশ ছিল 'তোমরা ব্রহ্ম হও, অর্থাৎ, ব্রহ্মের মত পরিপূর্ণতা লাভ কর। তোমাদের জীবন হোক দিব্য জীবন, তোমাদের সমাজ হোক দিব্যসমাজ, তোমাদের রাষ্ট্র হোক ধর্মরাষ্ট্র। ধর্মরাষ্ট্র বলতে বোঝায় সেই রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য লোক-সংস্থিতি, যে রাষ্ট্রে দুর্বৃত্তেরা দণ্ডিত ও শিষ্টেরা পালিত হয় এবং প্রত্যেকে কর্ম করে আত্মবিকাশ ও লোক-কল্যাণের জন্য।

যাঁরা চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, তাঁরা জানতেন, ইন্দ্রিয়সংযমই হচ্ছে কল্যাণের পথ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ নয়। অবশ্য, সে যুগেও কেউ কেউ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করতেন, তাঁরা গার্হস্থ্যাশ্রমে কখনও প্রবেশ করতেন না। কিন্তু ঋষিগণের বিধান ছিল: ব্রহ্মচর্যব্রত সমাপ্ত করে তোমরা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করবে, আর গৃহস্থের আদর্শই হবে লোক-কল্যাণ। প্রজা-তন্তুকে কখনও ছিন্ন হতে দেবে না, কারণ, সন্তান-সন্ততির ভেতর দিয়েই পিতৃ-পিতামহের চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়। প্রাচীন ভারতে সৌজাত্যবিদ্যা বা ইউজেনিক্সেরও যথেষ্ট চর্চা হয়েছিল, কিভাবে 'সুসন্তান' লাভ করা যায় তার নির্দেশও ভারতের মনীষিগণ দিয়েছিলেন। গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রশংসা করে মনু মহারাজ বলেছেন: চারটি আশ্রমের ভেতর গার্হস্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। মাতাকে আশ্রয় করে যেমন সকল প্রাণী জীবিত থাকে, তেমনি অন্যান্য আশ্রমিগণ (ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি) গৃহস্থকে আশ্রয় করেই জীবন ধারণ করেন। মহাকবি কালিদাস বলেছেন:

রঘুবংশীয় নৃপতিগণ শৈশবে বিদ্যাভ্যাস করতেন, যৌবনে বিষয়ী হতেন, বার্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করতেন এবং পরিণামে যোগ অবলম্বন করে দেহত্যাগ করতেন।

'শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥' ইত্যাদি
—রঘুবংশ ১ম সর্গ

যে কালে গুরু. আচার্য বা ঋষিগণ গৃহস্থ ছিলেন, সেকালে নির্বিচার সন্ন্যাসগ্রহণের আদর্শ প্রশ্রয় পায়নি। (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোথাও সন্ন্যাসের আদর্শ স্থাপন করেননি, তবে তিনি সন্ন্যাস কথাটার নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেন: সংসারে থেকেও মানুষ সন্ন্যাসী হতে পারে। যিনি দ্বেষও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী) যিনি কামনার অধীন ও ফলে আসক্ত, তিনি বন্ধনপ্রাপ্ত হন। এটা অবশ্য খুব বড় আদর্শের কথা, আর এ আদর্শকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করা হয়ত খুবই দুরূহ, তথাপি আমাদের লক্ষ্যকে আমরা যত বড় রাখব, আমাদের জীবন ততই মহত্তর ও উন্নততর হবে। একজন ইংরেজ কবি বলেছেন:

Frail creatures are we all ! to be the best
Is but the fewest faults to have.

আমরা সবাই অপূর্ণ জীব, তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ পুরুষ যাঁর দোষের মাত্রা সবচেয়ে কম। মহর্ষি বাল্মীকির শ্রীরামচন্দ্রও এই আদর্শেই পরিকল্পিত, তিনি দেবতা নন, বহুগুণসম্পন্ন দুর্লভ পুরুষ, তিনি নরচন্দ্রমা। মহর্ষি বাল্মীকির মনে যে মহামানবের পরিকল্পনা জেগেছিল, তিনি বহু দুর্লভ গুণের অধিকারী, তাই দেবর্ষি নারদ তাঁকে বলেছিলেন:

বহবো দুর্লভাশ্চৈব স্বয়ৈতে কীর্তিতা গুণাঃ।
একস্মিন্ হি নৃলোকেঽস্মিন্ গুণা এতে সুদুর্লভাঃ॥
দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্গুণৈর্যুতম্।
শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্যো যুক্তো নরচন্দ্রমাঃ॥
—রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ১।৯-১০

'বহু সুদুর্লভ গুণ কীর্তন করিলে তুমি এবে,
দুর্লভ এ নরলোকে এত গুণ একটি মানবে।

দেবতাগণেও নাহি এত গুণ করি নিরীক্ষণ,
আছেন এহেন তবু 'গুণাধার নর একজন'।

—অনুবাদ : আশালতা সেন

তাই মহর্ষি বাল্মীকির শ্রীরামচন্দ্র চিরদিন আমাদের আদর্শ, তাই তিনি দেবতারূপেও পূজিত।

কর্মসন্ন্যাস যে সকলের আদর্শ হতে পারে না একথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তমরূপেই জানতেন। গৃহী আদর্শভ্রষ্ট হ'লে সমাজের যতটা অকল্যাণ হয়, সন্ন্যাসী আদর্শভ্রষ্ট হ'লে তার চেয়ে অনেক বেশী অকল্যাণ ঘটে থাকে। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু সামান্য অনবধানতার দরুণ ছোট হরিদাসের প্রতি গুরুতম দণ্ডবিধান্ করেছিলেন।

আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই, যাঁরা বৌদ্ধধর্মের শান্ত-শীতল পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের ভেতর অনেকে অনধিকারী হয়েও ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁদের অনেকেরই ব্রতভঙ্গ হয়েছিল। রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের অনেকের ভেতরেও এককালে দুর্নীতি প্রশ্রয় পেয়েছিল। মনীষী লেকি তাঁর History of European Morals-গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে, কলিযুগে মাত্র দুটি আশ্রম রয়েছে—গার্হস্থ্য আর সন্ন্যাস। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছে করলেই সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতে পারবে না। এ বিষয়ে মহানির্বাণতন্ত্রে কঠোর ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, যথা :

'মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ ॥'

—মহানির্বাণতন্ত্র, অষ্টম উল্লাস, ১৭ শ্লোক

বৃদ্ধ মাতা-পিতা, পতিব্রতা ভার্যা ও শিশু তনয়, এদের পরিত্যাগ করে অবধূতাশ্রম (সন্ন্যাসাশ্রম) গ্রহণ করবে না।

আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও কোন কোন মনীষী এই বিষয়টির আলোচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, অনেক সময় দেখা গেছে যাঁরা অসাধারণ ধী-শক্তির অধিকারী এবং যাঁদের বিচার ও বিশ্লেষণ-শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তাঁরা অনেকেই ধর্মোন্মাদনার প্রভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। এতে কিন্তু সমাজের অকল্যাণই হয়েছে বেশী। এঁদের সন্তান-সন্ততি হতে পারতো সমাজের সম্পদ, এঁরা কিন্তু সমাজকে এই সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছেন।

মনস্বী টি. এইচ. গ্রীণ প্রমুখ দার্শনিকবৃন্দ বলেছেন : মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে আত্মোপলব্ধি বা পূর্ণতালাভ। সংসার ও সমাজের মধ্যে থেকেই মানুষকে এই লক্ষ্যে পৌছতে হবে। কারণ, যে সন্ন্যাসী তাঁর জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হতে পারে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এমন কথা বলেননি, কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রমের চাইতে যে সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ, এমন কথাও তো তিনি বলেননি। বরং এই কথাই তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, যিনি অনাসক্তভাবে কর্তব্যকর্ম করেন, তিনি গৃহে থেকেও সন্ন্যাসী। শ্রীভগবান বলেছেন—কর্মযোগ ভিন্ন সন্ন্যাস লাভ করা কষ্টসাধ্য। সন্ন্যাস অবলম্বন করলেই যে মানুষ মুক্তিলাভ করবে, এ কথা যেমন সত্যি নয়, তেমনি গৃহী হলে বা সমাজে বাস করলেই যে মানুষের বন্ধন হবে, এ কথাও সত্যি নয়। সংসারী মানুষ যদি যোগযুক্ত হয়ে কর্ম করে তবে সে কর্ম কখনও বন্ধনের কারণ হয় না। মানুষ সংসার ত্যাগ করতে পারে কিন্তু ইচ্ছা করলেই সে কর্ম ত্যাগ করতে পারে না। মানুষের পাঁচটি হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর পাঁচটি হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয়, এই দশটি ইন্দ্রিয় প্রকৃতির বশেই কাজ করে। সুতরাং মানুষের আদর্শ হচ্ছে আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করা এবং কর্মফল ব্রহ্মে অর্পণ করা। যোগীরা কর্ম করবেন আত্মশুদ্ধির জন্যে, কারণ, যারা কামনার বশীভূত হয়ে কর্ম করে, তারা কখনও পরমা শান্তি লাভ করতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগে সুখ হয় বটে কিন্তু সে সুখের আদি রয়েছে, অন্তও রয়েছে, আর সে সুখ হচ্ছে পরিণামে দুঃখদায়ক, তাই জ্ঞানী ব্যক্তি সে সুখে আসক্ত হন না। শুধু যে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরাই সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন হতে পারেন ও সর্বজীবে সমদর্শী হতে পারেন, তাই নয়, সংসারে থেকেও মানুষ দ্বন্দ্বাতীত ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।

সংসারে যত অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, তাদের অধিকাংশের মূলে রয়েছে কাম বা ক্রোধ। এখানে 'কাম' কথাটি সংকীর্ণ অর্থেও প্রয়োগ করা চলে, আবার ব্যাপক অর্থেও ব্যবহার করা চলে। শ্রীভগবান বলেছেন :

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥

—গী. ৫।২৩

যিনি দেহত্যাগের পূর্বে ইহলোকেই কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করতে পারেন, তিনিই যোগযুক্ত, তিনিই সুখী।

শ্রীভগবান অন্যত্র বলেছেন, কাম ও ক্রোধ রজোগুণ থেকে উৎপন্ন, আবার ক্রোধেরও মূলে রয়েছে কাম, কেন না, কামনা বাধাপ্রাপ্ত হলেই ক্রোধের সঞ্চার হয়।

মহামতি চরক বলেছেন : আমাদের সকল মানসিক ব্যাধির মূলে রয়েছে রজোগুণ আর তমোগুণ। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য, স্মৃতি ও সমাধির দ্বারা মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করবে।

আমরা দেখেছি, শ্রীভগবান যে আদর্শ সমাজের পরিকল্পনা করেছেন, তা হচ্ছে দেবমানবের সমাজ। এ সমাজে মানুষ গৃহী হয়েও সন্ন্যাসী হতে পারে। মানুষ পশু হয়ে জন্মায় বটে কিন্তু সাধনা ও তপস্যার দ্বারা সে ধীরে ধীরে মনুষ্যত্ব, দেবত্ব ও ব্রহ্মত্ব লাভ করে। যে মানুষ অনাসক্ত ও ইন্দ্রিয়জয়ী, সুখ একমাত্র তাঁরই করায়ত্ত। তাই শ্রীভগবান বলেছেন : যথার্থ সুখী হতে চাইলে কাম ও ক্রোধের বেগ ধারণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহামতি চরক যা বলেছেন, তাও আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন :

'বুদ্ধিমান ব্যক্তি মল, মূত্র, বমি, হাঁচি, উদ্গার, জৃম্ভা (হাই তোলা), ক্ষুধা তৃষ্ণা, ক্রন্দন, নিদ্রা ও শ্রমজনিত নিশ্বাসের বেগ ধারণ করবে না। কিন্তু ধীমান ব্যক্তি ঐহিক ও পারত্রিক সুখের জন্যে লোভ, শোক, ভয়, ক্রোধ, মান, লজ্জাহীনতা, ঈর্ষা, অতিরাগ এবং পরধনে স্পৃহার বেগ ধারণ করবে। কাম, পরপীড়নের প্রবৃত্তি, চৌর্য ও হিংসাদির বেগ ধারণ করা উচিত।'

(মানুষকে দেবজন্ম লাভ করতে হলে সাধনার আশ্রয় নিতে হবে, কারণ, ফাঁকি দিয়ে কেউ স্বর্গলাভ করতে পারে না। সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা যে শিক্ষার ভেতর দিয়ে মানুষ নবজন্ম লাভ করতে পারে। স্বামিজী বলেছেন : আমাদের ভেতর যে পূর্ণতা রয়েছে, সেই পূর্ণতার বিকাশ যাতে হয়, সেই হচ্ছে শিক্ষা বা যথার্থ জ্ঞানলাভ। কর্মের ভেতর দিয়েই আমাদের এই জ্ঞান লাভ করতে হবে। কিন্তু এর জন্যে সন্ন্যাস গ্রহণের কোনও প্রয়োজন নেই, অতি কঠোর তপস্যার দ্বারা শরীর-কর্ষণেরও আবশ্যকতা নেই, এর জন্যে প্রথম প্রয়োজন—কোনও প্রকার অবসাদ বা নৈরাশ্যকে হৃদয়ে স্থান না দেওয়া, আর দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে সর্বপ্রকার আতিশয্য বর্জন করা)

১০

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যে কালে নরবপু ধারণ করে ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সে কালে ভারতবর্ষে নানা দিক দিয়েই ধর্মের গ্লানি ঘটেছিল। তাই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, তপস্যার দ্বারা দেহকে কর্ষণ করাই কল্যাণের পথ নয়, আর কোন বিষয়েই আতিশয্য বাঞ্ছনীয় নয়। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বলেছেন, অকর্মের চাইতে কর্ম শ্রেষ্ঠ, আর কর্ম-সন্ন্যাসের চাইতে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়-সমূহকে সংযত করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে স্মরণ করে, সে হচ্ছে মিথ্যাচারী ; তাই দেখা যাচ্ছে, সন্ন্যাস-গ্রহণ অনেকের পক্ষেই মিথ্যাচার। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—প্রকৃত সন্ন্যাসী হচ্ছেন তিনি, যিনি কর্মফলের ওপর নির্ভর না করে অনলস ভাবে কর্তব্যকর্ম করেন। শ্রীকৃষ্ণের বাণী হচ্ছে—যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড নিষ্ফল না হলেও এদের দ্বারা মানুষ পরমপদ বা মুক্তিলাভ করতে পারে না, আর স্বধর্মের অনুসরণই হচ্ছে পরম কল্যাণলাভের উপায়, তাই প্রত্যেকেরই স্ব-স্ব অধিকারে বর্তমান থেকে লোকসংগ্রহ বা লোক-কল্যাণের জন্য কর্ম করা উচিত। মানুষে-মানুষে অধিকার-ভেদ স্বীকার করেও যে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা সমদর্শী হওয়া যায়, এ কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত আর কেউ এমন দ্বিধাহীন ভাষায় প্রচার করেননি। তিনি যে চাতুর্বর্ণ্যের কথা বলেছেন, সে চাতুর্বর্ণ্যের ভিত্তি হচ্ছে মানুষে মানুষে গুণগত বৈষম্য, বংশানুক্রমিক চাতুর্বর্ণ্যের কথা শ্রীকৃষ্ণ কোথাও প্রচার করেননি। অতি দুরাচার ব্যক্তিকেও তিনি আশার বাণী শুনিয়েছেন। আবার জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই যে পরমপদ লাভের অধিকারী, সে কথাও তিনি কুরুক্ষেত্রের সমরপ্রাঙ্গণে ঘোষণা করেছেন।

মানুষের সমাজ গতিশীল (dynamic), জীবদেহের মত সমাজদেহেরও একটা বিকাশ আছে। অনেক সমাজবিজ্ঞানী ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ (Theory of Evolution) সমাজের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু সমাজের অভিব্যক্তি আর সমাজের অগ্রগতি (Social Evolution and Social Progress) এক জিনিস নয়। সমাজ অর্থাৎ সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ যখন কোনও একটা মহান্ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার জন্যে সচেতন ভাবে চেষ্টা করে, তখনই বুঝতে হবে সমাজের যথার্থ অগ্রগতি হচ্ছে। (যাঁদের আমরা মহাপুরুষ বা অবতার বলি, তাঁরা প্রবল ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে

সমাজকে অতি দ্রুতগতিতে একটা লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যান্। এঁদের অনেক সময়ে একটা বিপ্লবের পথ বেছে নিতে হয়। কার্লাইলের ভাষায় এঁরা হচ্ছেন Heroes বা জননায়ক, এমার্সনের ভাষায় এঁরাই হচ্ছেন Representative Men বা যুগমানব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শুধু একজন বরেণ্য পুরুষ বা মহামানব নন, তিনি পুরুষোত্তম বা পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শ, তিনি ধর্মভিত্তিক অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ঊনবিংশ শতকের তিনজন বাঙালী মনীষী তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র-মাহাত্ম্য প্রচার করে জাতিকে প্রবুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এঁরা হচ্ছেন—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও মহাকবি নবীনচন্দ্র।

কোনও ব্যক্তি বা জাতির জীবনে চরম অভিশাপ দেখা দেয় তখনই, যখন ব্যক্তি বা জাতি অবসাদগ্রস্ত ও নৈরাশ্যপীড়িত হয়ে পড়ে। বৈরাগ্য আর অবসাদ এক জিনিস নয়। বৈরাগ্য হচ্ছে সত্ত্বগুণের আর অবসাদ হচ্ছে তমোগুণের প্রকাশ। কুরুক্ষেত্রের সমরপ্রাঙ্গণে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের চিত্ত অবসাদগ্রস্ত ও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে শ্রীভগবান বিশ্বের নরনারীকে অভয় দিয়ে বলেছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥

—গী. ৬।৫-৬

আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করবে, আত্মাকে কখনও অবসাদগ্রস্ত করবে না, কারণ, আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার আত্মাই আত্মার শত্রু।

যে নিজের শক্তিতে মনকে জয় করেছে, আত্মা তাঁর বন্ধু, কিন্তু নিজের মনকে যে জয় করেনি, সে নিজের প্রতি শত্রুত্বে প্রবৃত্ত হয়।

মহাপরিনির্বাণের পূর্বে ভগবান তথাগতও স্বীয় শিষ্য আনন্দকে এই ভাবের কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন—হে আনন্দ, আত্মদীপ হয়ে বিহার কর, অনন্যশরণ হয়ে (অর্থাৎ কারও আশ্রয় না নিয়ে) বিচরণ কর, (মতান্তরে 'আত্মদ্বীপ' হয়ে বিহার কর), ধর্মদীপ হয়ে বিহার কর, ধর্মশরণ হয়ে বিচরণ কর। প্রত্যেক নরনারী জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সাধনা ও তপস্যার দ্বারা নিজেই

নিজের ভাগ্য রচনা করতে পারে, পূর্ণতালাভ সকলেরই সাধ্যায়ত্ত, এটাই ছিল বুদ্ধদেবের বাণী।

মানুষ যেখানে সর্বপ্রকার আতিশয্য বর্জন করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, সেখানেই সুস্থ সমাজ গড়ে উঠে। সেখানে কখনও ধনী ও দরিদ্রে মারাত্মক বৈষম্য দেখা দেয় না, বিলাসিতা ও অর্থগৃধ্নুতা সেখানে প্রশ্রয় পায় না, সুতরাং সে সমাজে বিপ্লবের ভেতর দিয়ে জনসাধারণের দাবি আদায়ের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তাই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধ্যপন্থার কথা বলেছেন। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ভগবান তথাগতও উপলব্ধি করেছিলেন যে মধ্যপন্থাই মানুষের পক্ষে কল্যাণের পন্থা। মনস্বী অ্যারিস্টটলের মতে আতিশয্যই পাপ, আর মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই ধর্ম। (Virtue is a means between two extremes.) যেমন কার্পণ্য ও অমিতব্যয়িতা উভয়ই বর্জনীয়, কিন্তু মিতব্যয় এই দুই আতিশয্যের মধ্যস্থলবর্তী বলে গুণের মধ্যে গণনীয়। আবার ভীরুতা মানুষের একটি প্রধান দোষ, হঠকারিতাও আর একটি প্রধান দোষ, কিন্তু বীরত্ব মানুষের একটি মহৎ গুণ। এটা হচ্ছে অ্যারিস্টটলের Theory of the Golden mean.

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

> নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
> ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥
> যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
> যুক্তস্বপ্নাবাবোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥
>
> গী. ৬।১৬-১৭

যে বেশী আহার করে তার যোগ হয় না, যে বেশী উপবাস করে তারও হয় না, যে বেশী ঘুমায় তারও হয় না, আবার যে বেশী জাগরণশীল তারও হয় না।

যে ব্যক্তি পরিমিত রূপে আহার-বিহার করেন, সকল কর্মে যিনি যুক্তচেষ্ট (কখনও মাত্রা লঙ্ঘন করেন না), নিদ্রায় ও জাগরণেও যিনি যুক্ত অর্থাৎ মাত্রা অনুসারে চলেন, তাঁর পক্ষেই যোগ দুঃখনাশক হয়।

বাস্তবিকই 'সর্বমত্যন্তগর্হিতম্'। আমাদের দেশে একটি চলতি কথা আছে—

'অতি উঁচু হয়ো না, ঝড়ে ভেঙে নেবে,
অতি নীচু হয়ো না ছাগলে মুড়ে খাবে।'

আজকাল আমরা সর্বত্র 'স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী'র কথা শুনতে পাই। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার কথা। পরের সুখে সুখী হবে, এটা হচ্ছে মৈত্রীর আদর্শ। পরের দুঃখে দুঃখী হবে, এটা করুণার আদর্শ। অপরের পুণ্যকর্ম দেখলে আনন্দিত হবে, এটা মুদিতার আদর্শ। অপরের পাপে উদাসীন হবে এটা উপেক্ষার আদর্শ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু দার্শনিক ভিত্তির ওপর তাঁর সাম্যবাদের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন 'সান্ত্ববাদী' বা শান্তিকামী, তথাপি তিনি কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বা স্বীয় বংশের ধ্বংসলীলা নিবারণ করতে পারেননি। অবশ্য, তিনি এ কথাও জানতেন যে, মানুষ যে পর্যন্ত সাম্যে প্রতিষ্ঠিত বা সমদর্শী না হবে, সে পর্যন্ত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হতে পারে না। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন। 'অসুর-মানব'কে দেবমানবে পরিণত করতে না পারলে পৃথিবীতে বিরোধের অবসান কোনোদিনই হবে না। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন-মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥
—গী. ৬।৯

সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও পাপীতে যিনি সমবুদ্ধি, তিনিই বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হন।

এই শ্লোকের আলোচনাপ্রসঙ্গে মনস্বী ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু বলেছেন—'সুহৃৎ, মিত্র ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা মনুষ্যসমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত যতপ্রকার সম্পর্ক হতে পারে, তার উল্লেখ করা হয়েছে। সুহৃৎ অর্থে অন্তরঙ্গ সখা, যিনি হিতৈষী তাঁকে মিত্র বলা হয়, যাঁর সহিত শত্রুতা বা মিত্রতা কোন সম্বন্ধই নাই, তিনি উদাসীন, যিনি স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়ের কল্যাণকামী তিনি মধ্যস্থ, যাঁকে ভাল লাগে না, তিনি দ্বেষ্য ও প্রিয়ব্যক্তি বন্ধু নামে অভিহিত হন। (ভাষা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত।)

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীভগবান যোগের আলোচনাপ্রসঙ্গে আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন বটে কিন্তু তিনি ক্রিয়াযোগকে প্রাধান্য দেননি।

সংস্কৃতে 'যোগ' কথাটি নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ভগবদ্‌গীতায়ও কোথাও অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিকে 'যোগ' বলা হয়েছে, (যেমন—তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্), কোথাও কর্মের কৌশলকে 'যোগ' বলা হয়েছে (যোগঃ কর্মসু কৌশলম্)। মহামতি সঞ্জয় (অর্থাৎ ভগবান বেদব্যাস) 'যোগেশ্বর' কথাটি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণরূপে প্রয়োগ করেছেন। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীভগবান যে যোগের কথা বলেছেন, তার অর্থ হচ্ছে সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে একটি লক্ষ্যের অভিমুখ করা। 'যোগী' কথাটি শুনে আমাদের আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে হলে আমাদের যোগী হতে হবে, অর্থাৎ, মনকে একটি লক্ষ্যের অভিমুখ করতে হবে। শ্রীভগবান বলেছেন—'তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, কর্মকাণ্ডী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও।' শ্রীভগবানের এই কথার তাৎপর্য একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে হবে। আমরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলব তাঁকে যিনি শুধু যোগযুক্ত নন, যিনি সমদর্শী অর্থাৎ যিনি সকলকে নিজের মত দেখেন (আত্মৌপম্যেন পশ্যতি), আর যিনি শ্রীভগবানে মন যুক্ত রেখে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভজনা করেন। একটু চিন্তা করলেই এ কথা বোঝা যায় যে শ্রীভগবান যে আদর্শ প্রচার করছেন, তা হচ্ছে কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির ভিতর সমন্বয়ের আদর্শ। আমরা মহাসমন্বয়াচার্য জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার প্রণাম করি।

১১

ভারতের মহাকবিগণের শিক্ষার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তাঁরা কখনও মানুষের জীবনকে পরস্পর-বিযুক্ত কতিপয় কক্ষে (air tight compartments) বিভক্ত করেননি। তাঁদের দৃষ্টিতে ধর্মে ও কর্মে, ইহলোকে ও পরলোকে, ব্যক্তিগত কল্যাণে ও সামাজিক কল্যাণে, ভোগে ও বৈরাগ্যে কোন বিরোধ নেই। যে সব আদর্শ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরুদ্ধ, তাদের ভিতর কেমন করে সমন্বয় সাধন করতে হয়, সেই কৌশল তাঁরা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। ভারতের মহাকবি বলতে আমি অবশ্য সেই তিনজন বরেণ্য পুরুষকে বুঝেছি যাঁদের ধ্যানে ভারতীয় সাধনার সমগ্র রূপটি উদ্ভাসিত হয়েছিল। এঁরা হচ্ছেন মহর্ষি বাল্মীকি, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ও বাণীর বরপুত্র মহাকবি কালিদাস।

দার্শনিক টি. এইচ. গ্রীণ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Prolegomena to Ethics-এ পূর্ণতা বা আত্মোপলব্ধির যে আদর্শ স্থাপন করেছেন, সেটা হচ্ছে বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম, অর্থ ও কামের সমন্বয়ের আদর্শ। গ্রীণের মতে সমাজের ভিতর থেকেই প্রত্যেক মানুষকে পূর্ণতা লাভ করতে হবে। তাঁর মতে ব্যষ্টির কল্যাণেই সমষ্টির কল্যাণ এবং সমষ্টির কল্যাণেই ব্যক্তির কল্যাণ ঘটে থাকে। আদর্শ পুরুষ তাঁর হৃদয়াবেগকে, তাঁর জৈব প্রবৃত্তিসমূহকে যুক্তির দ্বারা সংযত করবেন, কেন না, সংযমের দ্বারাই মানুষ জীবনে সর্বোত্তম মঙ্গল লাভ করে থাকে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা নয়। গ্রীণ যা বলেছেন, তাঁর সব কথাই ভগবদ্‌গীতায় রয়েছে, আবার গ্রীণ যা বলেননি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সে সব কথাও বলেছেন।

ভগবান বলেছেন, মানুষের ভিতর যা কিছু সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক ভাব সবকিছু আমা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের জীবনে প্রত্যেকটি গুণেরই সার্থকতা আছে। গীতাতেই বলা হয়েছে, কাম ও ক্রোধ রজোগুণ থেকে উৎপন্ন কিন্তু কাম বা ক্রোধ না থাকলে সৃষ্টিরক্ষা হয় না বা দুষ্টের দমন হয় না।

আমরা মহামানব বা লোকোত্তর পুরুষদের ভিতর যে সকল গুণ দেখতে পাই, তার ভিতর একটা হচ্ছে অজেয় পৌরুষ। নাট্যকার ভবভূতি বলেছেন, লোকোত্তর পুরুষদের চরিত্র একই সঙ্গে বজ্রের চেয়েও কঠোর, আবার কুসুমের চেয়েও কোমল। শ্রীভগবান যখন বললেন, 'আমি মানুষের ভিতর পৌরুষ', তখন প্রকারান্তরে এ কথাও বলা হল যে পৌরুষ শ্রীভগবানের বিভূতি। এ কথার তাৎপর্য এই যে, সংসারে প্রত্যেক মানুষেরই পৌরুষের চর্চা করা উচিত। পৌরুষবিহীন মানুষ মানুষ নামের অযোগ্য।

শ্রীভগবান বলছেন, 'আমিই বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি, আমিই তেজস্বীদের তেজ।' ('বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।') আমরা মানুষের মধ্যে যে বুদ্ধি ও তেজের প্রকাশ দেখতে পাই, তা হচ্ছে শ্রীভগবানের বিভূতি। মানুষ আজ জগতের ওপর, সর্বভূতের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে কিসের বলে? বুদ্ধির বলে। অ্যারিস্টটল মানুষের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, যুক্তিবিজ্ঞানে তা গৃহীত হয়েছে। তিনি বলেছেন—মানুষ বুদ্ধিবিচারসম্পন্ন জীব (Man is a rational animal)। সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে এই কথাটি অন্য ভাবেও বলা হয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানী বলছেন—মানুষ দায়িত্বসম্পন্ন জীব (Man is a responsible animal)। গায়ত্রী মন্ত্রে ভর্গদেব সম্পর্কে বলা হয়েছে—'যিনি আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণা দান করেন।' মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে তার সকল কর্মই বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রও বলছেন—শুধু শাস্ত্র আশ্রয় করে মানুষ কর্তব্য নির্ণয় করবে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও মহাভারতে উদাত্তকণ্ঠে বলেছেন—শ্রুতিতে ধর্ম আছে বটে (কর্তব্যের নির্দেশ আছে বটে) কিন্তু কখন কোন্ অবস্থায় মানুষের কি করা উচিত, তার নির্দেশ শ্রুতিতে মেলে না। সুতরাং মানুষকে যুক্তি আশ্রয় করে কর্তব্য নির্ণয় করা উচিত।

(সংসারে তেজস্বী পুরুষই গৌরব লাভ করে কিন্তু যে ব্যক্তি নিত্য ক্ষমাশীল, তাকে লোকে দুর্বল বলে উপহাস করে। এইজন্যে আমাদের প্রয়োজনমত তেজস্বী হতে হবে। যজুর্বেদের ঋষিরা প্রার্থনা করেছেন—'হে তেজঃস্বরূপ, তুমি আমাদের মধ্যে তেজ সঞ্চারিত কর।'

শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন—

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥
গীতা—৭।১১

আমি বলবানদের সেই বল, যে বল কামনা ও আসক্তিবর্জিত,—আমি প্রাণিগণের সেই কাম যে কামের সঙ্গে ধর্মের কোন বিরোধ নেই)

যেখানে কামনা ও আসক্তি থাকে, সেখানে মানুষ বলের অপব্যবহার করে। মানুষকে বলের চর্চা করতে হবে আসুরী শক্তিকে বাধা দেবার জন্যে, সবলের আক্রমণ থেকে দুর্বলকে রক্ষা করার জন্যে। সংসারে দুর্বলতা, ভীরুতা বা কাপুরুষতার মত পাপ নেই। আমাদের শাস্ত্রকারও বলেছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ', বলহীন ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করতে পারে না। বল বলতে দৈহিক বল, মানসিক বল, আত্মিক বল সব কিছুই বোঝায়। ভাষ্যকার 'বলহীনেন' কথাটির অর্থ করেছেন 'ব্রহ্মচর্যহীনেন', একদিক দিয়ে এ ব্যাখ্যাও সঙ্গত হয়েছে। মহর্ষি পতঞ্জলিও বলেছেন—'ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হলে দেহে ও মনে অপরিসীম বীর্য লাভ হয়।' অথর্ববেদের ব্রহ্মচর্যসূক্তে ব্রহ্মচর্যের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। ঋষি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—যাঁরা ভোগের বাসনা

চরিতার্থ করতে চান, তাঁদের পক্ষেও ব্রহ্মচর্য-পালন অত্যাবশ্যক। কায়মনোবাক্যে যিনি শুদ্ধ, তাঁর দেহে ওজঃ নামক ধাতু উৎপন্ন হয়—এ কথা বলেছেন মহামতি বাগ্‌ভট। এই ওজোধাতু সম্পর্কে তিনি বলেন—

যস্য প্রবৃদ্ধৌ দেহস্য তুষ্টিপুষ্টিবলোদয়ঃ।
যন্নাশে নিয়তং নাশো যস্মিংস্তিষ্ঠতি জীবনম্॥
নিষ্পাদ্যন্তে যতো ভাবা বিবিধা দেহসংশ্রয়াঃ।
উৎসাহ-প্রতিভা-ধৈর্য-লাবণ্য-সুকুমারতাঃ॥

অষ্টাঙ্গহৃদয়—(বাগ্‌ভট সংহিতা।)

ওজোধাতু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেই দেহের তুষ্টি, পুষ্টি ও বল জন্মে। এই ওজোধাতুর বিনাশেই মানুষের নিশ্চিত বিনাশ ঘটে। আমাদের জীবন এই ওজোধাতুতেই প্রতিষ্ঠিত। দেহসংশ্রিত সমস্ত ভাব—উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য, লাবণ্য, সৌকুমার্য—সকলই ওজোধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়।

শ্রীভগবান কামনা ও রাগ (আসক্তি)-বিবর্জিত বলের কথা এবং ধর্মের অবিরুদ্ধ কামের কথা বলেছেন। মনস্বী গিরীন্দ্রশেখর বসু বলেছেন—"কামরাগ-বিবর্জিত বল অর্থে সাত্ত্বিক বল বোঝাচ্ছে। অপ্রাপ্ত বিষয়প্রাপ্তির ইচ্ছার নাম কাম ও প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তির নাম রাগ।' শ্রীভগবানের নির্দেশ হচ্ছে—বল থাকা সত্ত্বেও আমরা অপ্রাপ্ত বিষয় পেতে ইচ্ছা করব না, প্রাপ্ত বিষয়েও আসক্ত হব না।

ধর্মের অবিরুদ্ধ কাম নিন্দনীয় নয়, কারণ, এর দ্বারা সমাজেরই কল্যাণ হয়ে থাকে। সুসন্তান লাভের জন্যেই পিতামাতাকে সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হওয়া উচিত, এটা ভারতীয় ঋষির নির্দেশ, আর এটাই ভারতীয় সৌজাত্যবিদ্যার (Eugenics) গোড়ার কথা। মহাভারতে বলা হয়েছে, সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি বাঞ্ছিত সন্তান লাভের জন্যে তীব্র নিয়ম অবলম্বন করলেন, তিনি যথাকালে নিয়মিত আহারে অভ্যস্ত হলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করলেন, ইন্দ্রিয়জয়ী হলেন।

'কাম' কথাটি অবশ্য ব্যাপক অর্থেও প্রয়োগ করা হয়। ব্যাপক অর্থে কাম কথাটির দ্বারা বোঝায় 'কামনা'। এই অর্থে কাম কথাটিকে গ্রহণ করলে শ্রীভগবানের উপদেশের তাৎপর্য দাঁড়ায়—আমাদের যে কামনা ধর্মের বিরোধী নয়, সে কামনা কখনও নিন্দনীয় হতে পারে না। আবার সংকীর্ণ অর্থেও

কাম কথাটির প্রয়োগ করা যায়। 'কাম' প্রথম রিপু বটে কিন্তু ইহাই জগৎ-সৃষ্টির মূল। তবে এই কাম ধর্মের সঙ্গে অবিরুদ্ধ হওয়া দরকার। মানব-সমাজে যে-সব অপরাধ সংঘটিত হয়, অনেক সময়েই তার মূলে রয়েছে 'ধর্মবিরুদ্ধ কাম'। সমাজবিজ্ঞানীরা অপরাধকে সামাজিক ব্যাধি বলে মনে করেন। তাঁরা এই সব ব্যাধির কারণ নির্দেশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে দণ্ডদানের প্রয়োজনের কথাও অনেক বিজ্ঞানীই স্বীকার করেছেন।

মহাভারতের শান্তিপর্বে মহর্ষি দেবস্থান যুধিষ্ঠিরকে ধর্মের যে সব লক্ষণ বলেছেন, তার মধ্যে 'কামে'রও স্থান রয়েছে। তিনি বলেছেন—

'অদ্রোহেণৈব ভূতানাং যো ধর্মঃ স সতাং মতঃ।
অদ্রোহঃ সত্যবচনং সংবিভাগো দয়া দমঃ॥
প্রজনঃ স্বেষু দারেষু মার্দবং হ্রীরচাপলম্।
এবং ধর্মং প্রধানেষ্টং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥'

মহাভারত—২১।১১-১২

পরের হিংসা না করে যে ধর্ম আচরিত হয়, সেটাই হচ্ছে সাধুজনের অনুমোদিত ধর্ম। স্বায়ম্ভুব মনু বলেছেন, জীবের অপকার না করা, সত্যকথা বলা, বিভাগ করে যথাসময়ে ক্ষুধিতকে অন্নদান, ইন্দ্রিয়দমন, দয়া, ধর্মপত্নীতে সন্তান জনন, মৃদুতা, লজ্জা, চপলতা প্রদর্শন না করা এ সমস্তই হচ্ছে প্রধান ধর্ম।

কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও সর্বত্র শুধু শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করলে চলবে না, এ সব ক্ষেত্রেও 'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যবিনির্ণয়ঃ', ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ।

পাশ্চাত্ত্যের কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন—(মানুষ নিজের প্রয়োজনেই নীতিশাস্ত্র রচনা করেছে। মানুষ অভিজ্ঞতার ফলে জানতে পেরেছে, সমাজে যাতে অধিকতম লোকের প্রভূততম সুখ হয় অথবা সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়, সেই পথেই তাকে চলতে হবে) কিন্তু কোনও নীতিই শাশ্বত বা চিরন্তন নয়—যাকে আমরা ঈশ্বরের আদেশ বলে মনে করি, তা বাস্তবিক পক্ষে মানুষের তৈরি। এই মত স্বীকার করলে নীতিশাস্ত্রকে লঘু করে দেখা হয়, সত্য শিব ও সুন্দরের আদর্শকেও অস্বীকার করা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু কখনও নীতিশাস্ত্রের গৌরবকে এভাবে খর্ব করেননি। আবার ক্যাণ্ট প্রমুখ দু-একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করেন—মানুষের কর্তব্যকর্ম হচ্ছে

দেশকালনিরপেক্ষ (categorical imperative), তাই কোনও অবস্থাতেই মানুষ আদর্শ থেকে স্খলিত হবে না। সদা সত্য কথা বলা যদি মানুষের কর্তব্য হয়, তবে তাকে সর্বদাই সত্যকথা বলতে হবে। এর ফলে যদি কারও মৃত্যুও ঘটে, সে দিকেও সে ভ্রূক্ষেপ করবে না। অহিংসা যদি মানুষের ধর্ম হয়, তবে তাকে সকল অবস্থায়ই কায়মনোবাক্যে অহিংস হতে হবে। এতে যদি সে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় বা আততায়ীর হস্তে নিহত হয়, তাতেও সে অবিকম্পিত থাকবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু কোথাও এরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ নির্দেশ দেননি। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর 'গীতারহস্যে' এ কথা প্রতিপন্ন করেছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন কোনও নির্দেশ দেননি, যার অপবাদ বা ব্যতিক্রম নেই। 'কর্মজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে লোকমান্য তিলক "সত্যভাষণ" সম্পর্কে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশের আলোচনা করেছেন। (বঙ্কিমচন্দ্রের 'শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র' দ্রষ্টব্য)। তিলক বলছেন—

'সত্যধর্ম কেবল শব্দোচ্চারণ-নিঃসৃত বাক্য নহে, কিন্তু যে ব্যবহারে সকলের কল্যাণ হয় সেই ব্যবহার শুধু শব্দোচ্চারণ অযথার্থ হইয়াছে বলিয়া গর্হিত বলা যাইতে পারে না। যাহাতে সকলের ক্ষতি হয়, তাহা সত্যও নহে, অহিংসাও নহে—

'সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদপি হিতং বদেৎ।
যদ্ভূতহিতমত্যন্তং এতৎ সত্যং মতং মম॥'

'সত্য বলা প্রশস্ত বটে, কিন্তু সত্য অপেক্ষাও সর্বভূতের যাহাতে হিত হয় সেইরূপ বাক্যই বলিবে, কারণ, সর্বভূতের যাহা অত্যন্ত হিত তাহাই আমার মতে প্রকৃত সত্য—এইরূপ শান্তিপর্বে সনৎকুমারের প্রসঙ্গে নারদ শুককে বলিয়াছেন।' (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ধর্মের আদর্শ কল্যাণের আদর্শের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত—আত্মকল্যাণ, স্বদেশের কল্যাণ, বিশ্বমানবের কল্যাণ, সর্বভূতের হিত মানুষ বলের চর্চা করবে লোকের কল্যাণের জন্যে, তেজস্বী হবে দুর্বৃত্তকে দমন করার জন্যে, সংযতভাবে কামের সেবা করবে বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, মেধাবী সন্তান লাভের জন্যে। আর কোনও অবস্থাতেই মানুষ এই কল্যাণ বা কুশলের আদর্শ থেকে প্রমত্ত হবে না।

১২

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার নবম অধ্যায়ে দেখতে পাই, শ্রীভগবান মানুষের প্রকৃতিকে দৈবী, আসুরী ও রাক্ষসী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। পৃথিবীর সকল সমাজেই এই তিন শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়। এই বিভাগটি ত্রিগুণ-তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত তাঁরা দেবতা, যাদের ভেতর রজোগুণ প্রবল, তাদের বলা যায় অসুর, আর যাদের ভেতর তমোগুণ প্রবল, তারা হচ্ছে রাক্ষস। আবার আমরা রাক্ষসী প্রকৃতির লোককেও অসুর বলতে পারি এবং সমগ্র মানব-জাতিকে দেবতা ও অসুর এই দু' শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। অবশ্য, মানুষ মাত্রেই অপূর্ণ, তাই সংসারে কোন মানবকেই দেবতা বলা চলে না, এমন কি, মহর্ষি বাল্মীকির পরিকল্পিত শ্রীরামচন্দ্রও দেবতা নন, বহুগুণান্বিত নরচন্দ্রমা। আবার যারা আসুরী বা রাক্ষসী প্রকৃতির অধিকারী, তাদের ভেতরও নানা প্রশংসনীয় গুণ দেখতে পাই। আমরা সংসারে যে সকল মানুষ দেখি, তারা প্রায়ই মিশ্র প্রকৃতির। তথাপি আমরা মানুষকে যখন দেবতা ও অসুর এই দু' শ্রেণীতে ভাগ করি, তখন আমরা প্রাধান্যের কথাই চিন্তা করি। যারা কাম-ক্রোধ ও রাগ-দ্বেষের অধীন, দম্ভ, মান, মদ ও মাৎসর্য যাদের চিত্তকে অভিভূত করেছে, তারাই হচ্ছে অসুর। এই অসুরপ্রকৃতির লোকেরা লোভের বশবর্তী হয়ে বা সাম্রাজ্য-বিস্তারের আশায় পররাজ্য গ্রাস করতে কুণ্ঠিত হয় না, অর্থসঞ্চয়ের জন্যে যে কোন অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। এই অসুরপ্রকৃতি লোকের সংখ্যা যে সমাজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সে সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত; দণ্ডদানের দ্বারা এই শ্রেণীর লোককে সংযত রাখতে হয়। মহাভারতে এই দণ্ডনীতির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে—যে রাজা দণ্ডের অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ডদান করেন এবং দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ডদান করেন না, তিনি মহৎ অযশ প্রাপ্ত হন এবং নরকে গমন করেন।

অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি ॥

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—'এ জগতে যা কিছু ঐশ্বর্যশালী, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু বলশালী বা গুণশালী, তা আমারই তেজের অংশ থেকে উৎপন্ন বলে জানবে।'

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

—গী. ১০।৪১

যাঁরা নরদেবতা, তাঁদের মধ্যে শ্রীভগবানের বিভূতি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। তবে এরূপ নরদেবতার সংখ্যা সকল দেশে বা সকল সমাজেই অত্যন্ত বিরল।

গীতার দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের কয়েকটি উক্তি আমাদের প্রণিধানযোগ্য। শ্রীভগবান বলেছেন—

সেনানীনামহং স্কন্দঃ

—গী. ১০।২৪

সেনানীগণের মধ্যে আমি স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয়।

কার্তিকেয় ছিলেন দেবসেনাপতি। তাঁর জন্ম হয়েছিল তারকাসুরকে নিধন করে অসুরের উপদ্রব থেকে স্বর্গরাজ্য উদ্ধারের জন্যে। দেবকার্য সাধনের জন্যই জগৎপিতা মহাদেব ও জগন্মাতা পার্বতীর মিলন ঘটেছিল। এই মিলনের ফল হচ্ছে 'কুমারসম্ভব'। দেবসেনাপতির মধ্যে সৌন্দর্য ও বীর্যের সমন্বয় ঘটেছিল। কিন্তু এই দেবসেনাপতির পূজা করতে আমরা ভুলে গেছি। যাঁরা আদর্শ পুরুষ; তাঁরা কিন্তু জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই সুরসেনাপতির চরিত্রের অনুকরণ করেন; কেন না, তাঁরা সর্বপ্রকার অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে থাকেন।

শ্রীভগবান আবার বলেছেন—

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ।

—গী. ১০।২৮

আমি প্রজা-উৎপত্তির কারণস্বরূপ কাম বা কন্দর্প।

আমাদের ঋষিগণের বিধান হচ্ছে—'প্রজাতন্তুং ন ব্যবচ্ছেৎসীঃ', 'প্রজাতন্তুকে কখনও ছিন্ন হতে দেবে না।' শ্রীভগবান কখনও এমন কথা বলেননি যে কামের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করতে হবে, কেন না, সমাজ-রক্ষার জন্যে কামের প্রয়োজন আছে, তবে সেই কাম ধর্মের সঙ্গে অবিরুদ্ধ হওয়া চাই। মানুষ বিচারবুদ্ধির দ্বারা তার জৈব প্রবৃত্তিকে সংযত করবে, তবেই সে প্রেয়ের ভেতর দিয়েও ধীরে ধীরে শ্রেয়কে লাভ করবে। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ যে

গার্হস্থ্যাশ্রমের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, তার আদর্শ ছিল পরম পবিত্র ও উন্নত। অসংযত বা উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ভোগবাসনা চরিতার্থ করার জন্য বিবাহ নয়, বিবাহের উদ্দেশ্য প্রজোৎপাদনের দ্বারা সমাজের কল্যাণ-সাধন। তাই গৃহস্থকে সুসন্তান লাভের জন্যে মিতাহারী, মিতাচারী, মিতাভাষী, ইন্দ্রিয়জয়ী হতে হয়। আমরা মহাভারতের বনপর্বে দেখতে পাই, সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি অভিমত অপত্যলাভের জন্যে কঠোর নিয়ম অবলম্বন করেছিলেন। তিনি যথাকালে পরিমিত আহার করতেন, তিনি ব্রহ্মচর্য সাধন করেছিলেন, ইন্দ্রিয়জয়ী হয়েছিলেন। দেবোপম পিতা অশ্বপতি তাই সাবিত্রীর মত কন্যা লাভ করেছিলেন।

শ্রীভগবানের কথার তাৎপর্য হচ্ছে, যাঁরা নরদেবতা, তাঁরা কখনও পশুর মত উচ্ছৃঙ্খলভাবে ইন্দ্রিয়সম্ভোগ করেন না, ধর্মের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট না হয়েও তাঁরা সমাজের মঙ্গলের জন্যেই সংযতভাবে কামের সেবা করেন, এতে তাঁদের দেবমহিমা ক্ষুন্ন হয় না।

অবশ্য যাঁরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা কর্মসন্ন্যাসী (কর্মত্যাগী), তাঁরাও জীবনে নিঃশ্রেয়স বা পরম মঙ্গল লাভ করে থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবান বলেছেন, কর্ম-সন্ন্যাসের চেয়ে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ, আর এই কর্মযোগীরা কর্ম করেন লোকসংগ্রহ বা লোকস্থিতির জন্যে, সুতরাং এঁরা ত্যাগবুদ্ধির দ্বারা ভোগ করেন আর সেই সংযত, পরিমিত ও বিচারমূলক ভোগ ধর্মেরই অন্তর্গত। ঈশোপনিষদেও বলা হয়েছে—'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ', 'ত্যাগ বুদ্ধির দ্বারা ভোগ করবে।'

শ্রীভগবান বলেছেন—

আধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং

গী. ১০।৩২

বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি আত্মবিদ্যা। এই আত্মবিদ্যা হচ্ছে পরা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যে বিদ্যার সাহায্যে আমরা বিজ্ঞান, শিল্প, চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি, তা হচ্ছে অপরা বিদ্যা। ভারতের প্রাচীন মনীষিগণ অপরা বিদ্যাকে উপেক্ষা করেননি, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অপরা বিদ্যার প্রয়োজনকে তাঁরা কখনও লঘু করে দেখেননি, কিন্তু এই সত্যও তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, পরা বিদ্যা লাভ না করলে মানুষ কখনও পরা শান্তি প্রাপ্ত হতে পারে না। এই পরা বিদ্যা শ্রীভগবানের বিভূতি। যাঁরা নরদেবতা, তাঁদের

ভেতর সত্ত্বগুণ প্রধান বলে তাঁরা আত্মজ্ঞান-লাভের জন্যে ব্যাকুল হন, আর তাঁদের ভেতরে এই বিদ্যা সহজেই স্ফুরিত হয়।

শ্রীভগবান আবার বলেছেন—

'তেজস্তেজস্বিনামহং'

গী. ৭।১০, ১০।৩৬

'আমি তেজস্বীদিগের তেজঃ।'

এই তেজ মনুষ্যত্বের একটি প্রধান অঙ্গ। যাঁরা সংসারে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁরা বলিষ্ঠ, দুর্জয় পৌরুষের অধিকারী। মনস্বিনী বিদুলা পুত্রকে বলেছিলেন, 'শিখাহীন তুষাগ্নির মত ধূমায়িত অবস্থায় বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করো না। চিরকাল ধূমায়িত হয়ে থাকার চেয়ে মুহূর্তকাল জ্বলে ওঠা ভাল।'*

যাঁরা তেজস্বী পুরুষ, তাঁরা কখনও নীরবে অন্যায় বা অত্যাচার সহ্য করেন না, সর্বপ্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়ান। সত্যের জন্যে, ধর্মের জন্যে, লোক-কল্যাণের জন্যে তাঁরা মৃত্যুকে বরণ করতেও কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা সম্পূর্ণরূপে 'অভয়' হয়ে থাকেন। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীভগবান যে সব দৈবী সম্পদের কথা বলেছেন, তার প্রথম কথাই হচ্ছে অভয়।

শ্রীভগবান বলেছেন—

'জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি'

গী. ১০।৩৬

'জয়শীলদের জয় আমি, উদ্যমী পুরুষদের উদ্যমও আমি।'

যাঁরা সংসারে মহামানব বলে পরিচিত, তাঁরা সত্ত্বগুণী হলেও তাঁদের ভেতর রজোগুণের প্রকাশ দেখা যায়। তাঁরা উৎসাহী, উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়ী, যে সকল গুণের অধিকারী হলে মানুষ জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়, সে সব গুণের প্রাচুর্য রয়েছে তাঁদের মধ্যে। সংসারে উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়ী লোকেরা অনেক ক্ষেত্রেই জয়ী হন। যারা অলস, নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট, তারা হচ্ছে তমোগুণী; বিজয়, ঐশ্বর্য বা সম্পদ তাদের জন্যে নয়, আর যারা বলদৃপ্ত ও

* তুলনীয়—

'One crowded hour of glorious life
Is worth an age without a name.'

শক্তিমদমত্ত, যাদের ভেতর প্রবল আত্মাদর রয়েছে, তারা হচ্ছে রজোগুণী, তারা হচ্ছে অসুর-প্রকৃতি, কিন্তু যাঁরা সত্ত্বগুণী হয়েও উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়ী, তাঁরাই ক্ষাত্রধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। নরোত্তম অর্জুন ছিলেন এই ক্ষাত্রধর্মের আদর্শ, তাই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন—

'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥'

গী. ২।৩৭

দেবতাদের সংগ্রাম অসুরদের বিরুদ্ধে—আর দেব-মানবদের সংগ্রাম আসুরী শক্তির বিরুদ্ধে। পুরাণসমূহে দেবাসুর-সংগ্রামের কাহিনীতে দেখা যায়, আপাততঃ অসুরেরা বিজয়ী হলেও পরিণামে দেবতাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

সংসারে কর্মযোগীমাত্রেই যোদ্ধা, তাঁরা কখনও হৃদয়দৌর্বল্যকে প্রশ্রয় দেন না। কিন্তু তাঁদের যুদ্ধকর্মের ভেতরেও একটি কৌশল আছে। সে কৌশলটি কি ?

কবি লংফেলোর অনুসরণে একদিন হেমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'সংসার-সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব।'

আর গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—'আমাকে রাখি স্মরণে, যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে', 'মামনুস্মর যুধ্য চ।' যারা কর্মবিমুখ, ভীরু ও চেষ্টাশূন্য, অনুক্ষণ ভগবানকে স্মরণ করেও (?) তারা বিজয় বা সিদ্ধিলাভ করতে পাবে না, আর যারা ভগবদ্বিমুখ, তারা দম্ভ, দর্প, আত্ম-প্রতিষ্ঠা বা সাম্রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে অপরের অশান্তি আনয়ন করে, অথবা পৃথিবীকে নররক্তপাতে কলঙ্কিত করে।

'হারকিউলিস ও শকটচালকের আখ্যায়িকাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই আখ্যানের অন্তর্নিহিত উপদেশ হচ্ছে—জীবনে যখন কোনও বিঘ্ন বা বিপদ এসে উপস্থিত হয়, তখন আত্মশক্তির আশ্রয় নিতে হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে দৈবশক্তির কাছেও প্রার্থনা করতে হয়।

শ্রীভগবান গীতার দশম অধ্যায়ে বলেছেন—

সত্ত্বং সত্ত্ববতামহং

গী. ১০।৩৬

'আমি সাত্ত্বিকভাবযুক্ত বা সত্ত্বপ্রধান লোকের সত্ত্বভাব।'

কিন্তু গীতার সপ্তম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন—

'যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥'

গী. ৭।১২

'যে কিছু সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহ আছে, সকলই আমা থেকে উৎপন্ন বলে জানবে, আমি সেসমূহে নেই কিন্তু তারা আমাতে আছে।'

তাৎপর্য হচ্ছে এই যে সকল ভাবই শ্রীভগবান থেকে উৎপন্ন হলেও সাত্ত্বিক ভাব হচ্ছে তাঁর বিভূতি। যাঁরা দেবমানব, তাঁরা এই সাত্ত্বিক ভাব বা দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীভগবান আবার বলেছেন—

'দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাং।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহং॥'

গী. ১০।৩৮

'আমি দমনকারীদের দণ্ড, জিগীষুদিগের আমি নীতি, গুহ্য বাক্যের মধ্যে আমি মৌন, জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের আমি জ্ঞান।' (জ্ঞান বলতে লৌকিক বা ব্যবহারিক জ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি।)

শ্লোকটির প্রথম তিন পাদে ক্ষাত্রধর্মের আদর্শই বিবৃত হয়েছে। যাঁরা দেবমানব, বিষয়ের প্রতি যাঁরা আসক্তিশূন্য, যাঁরা ইন্দ্রিয়জয়ী, মিতভাষী, কর্তব্যসাধনে অনলস, অতন্দ্রিত, একমাত্র তাঁরাই শাসনদণ্ড পরিচালনার অধিকারী। দার্শনিক-প্রবর প্লেটোও অনুরূপ মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে তত্ত্বজ্ঞানী দার্শনিকেরাই সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালিত করতে পারেন।

শ্রীভগবান বলেছেন, আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজা দুষ্কৃতকারীদের দণ্ড দান করবেন, নীতি অবলম্বন করে জয়ের ইচ্ছা করবেন (পররাজ্য-লিপ্সায় নয়, যশোলাভের আকাঙ্ক্ষায়), আর মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করবেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে সেকালে ক্ষত্রিয় রাজারা যশের জন্য পররাজ্য জয় করে পরাজিত রাজাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করতেন। রঘুর দিগ্বিজয়ের কথা স্মরণ করুন। রঘুবংশীয় রাজগণের সম্পর্কে মহাকবি কালিদাস লিখেছেন—

'এই নৃপতিগণ অর্থসঞ্চয় করতেন ত্যাগের জন্য, মিতভাষী হতেন সত্য রক্ষার জন্যে, জয়ের ইচ্ছা করতেন যশোলাভের আকাঙ্ক্ষায়, দারপরিগ্রহ করতেন সন্তান-কামনায়।' রাজা দিলীপ সম্পর্কে বলা হয়েছে—'তিনি সর্ববিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করতেন, তাই তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা ছিল ফলের দ্বারা অনুমেয়।'

যাঁরা মহামানব, যাঁরা জ্ঞানবান, তাঁরাই এই ক্ষাত্রধর্ম পালনের অধিকারী।

এক হিসাবে পৃথিবীর প্রত্যেক মহামানবই দুর্বৃত্তদমনের ভার গ্রহণ করেন, কেন না, তাঁরা কম্বুকণ্ঠে সর্ববিধ অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন, কখনও অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করেন না, পাপের সঙ্গে আপোস করেন না। রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেছেন—

'তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার, হে রাজাধিরাজ,
সে গুরু সম্মান তব, সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে, তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে।'

—নৈবেদ্য

একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আধুনিক 'সমাজদর্শনে' যাকে বলা হয় 'অভিজাততন্ত্র' (The Aristocratic Ideal), প্লেটো ও অ্যারিস্টটল ছিলেন তার সমর্থক। অভিজাততন্ত্রে জ্ঞানবান ও গুণবান ব্যক্তিদের ওপরেই শাসনভার অর্পিত হয়, যাঁরা দেবোপম মানব, তাঁরাই রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে লোককল্যাণ-সাধন। প্রাচীন ভারতের রাজতন্ত্রও একপ্রকার অভিজাততন্ত্র। ভারতীয় রাজতন্ত্রের আদর্শ প্রজাবর্গের হিতসাধন, প্রজানুরঞ্জন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই রাজধর্মের আদর্শই স্থাপন করেছেন, আর মহামতি ভীষ্ম এই রাজধর্মের মহিমা কীর্তন করেছেন। ভারতবর্ষে ক্ষাত্র ধর্মের আদর্শ কত উন্নত ছিল, ভারতের দুখানি জাতীয় মহাকাব্য পাঠ করলে তা উপলব্ধি করা যায়।

১৩

আমরা দেখেছি, লোক-কল্যাণ বা লোকহিতের আদর্শ ভারতবর্ষে নতুন নয়। 'অধিকতম লোকের প্রভূততম সুখ বা কল্যাণ যাতে সাধিত হয়, সেই কর্ম হচ্ছে মানুষের করণীয়'—এ কথা আমরা জন্ স্টুয়ার্ট মিলের কাছে শিখিনি. শিখেছি ভারতের পুরাতন আচার্যগণের কাছ থেকে। আচার্য শঙ্কর বলেছেন, আমাদের কর্ম হবে 'বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ'। প্রাচীন ঋষিদের মতে আমাদের গার্হস্থ্য আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে বহুজনের কল্যাণসাধন। কিন্তু এর চাইতে মহত্তর আদর্শ হচ্ছে সর্ব মানবের মঙ্গলসাধন, এ বিষয়ে ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের ফিলানথ্রপির আদর্শের মিলও রয়েছে, আবার অমিলও রয়েছে। মহামানব যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন—'প্রতিবেশীকে নিজের মতই ভালবাসবে' (Love thy neighbour as thyself), খ্রীষ্টের এই বাণী স্মরণ করে পাশ্চাত্ত্য দেশের অনেক ভক্ত ও সাধু পুরুষ মানবসেবার ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। এই সব মহাপুরুষ আমাদের নমস্য সন্দেহ নেই। এই ধর্মভিত্তিক মানবতাবাদ পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকেও প্রচারিত হয়েছে। আবার সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কম্‌টে বলেছেন, আমরা পৌরাণিক ও দার্শনিক যুগ অতিক্রম করে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যুগে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি। এ যুগে আমাদের উপাস্য ঈশ্বর নন, মানব-সমষ্টি—এ যুগে আমাদের নিকট পারত্রিক অমরতা একটা কল্পনা-বিলাস, আমাদের প্রার্থনীয় হচ্ছে ঐহিক অমরতা, কারণ, আমরা জানি 'কীর্তির্যস্য স জীবতি'।* এই যে আধুনিক প্রতীচ্য মানবতাবাদ, এর সঙ্গে ঈশ্বরচেতনা বা ধর্মচেতনার কোনও সম্পর্ক নেই, আর এ মতবাদের কোনও দার্শনিক ভিত্তিও নেই, এর মূলে রয়েছে মানুষ হিসাবে মানবমহিমার স্বীকৃতি ও কর্তব্য-বোধ। দার্শনিক ইম্যানুয়েল ক্যাণ্ট বলেছেন :

'Always treat humanity both in thine own person as well as in the persons of others, always as an end, never merely as a means.'

মানুষ হিসাবে তুমি যেমন নিজের, তেমনি অপরের ব্যক্তিসত্তাকে মর্যাদা

* এ সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠক মনস্বী কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নিভৃত চিন্তায়' 'বিরাট পুরুষ' ও 'ঐহিক অমরতা' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটো পাঠ করে দেখতে পারেন।

দান করবে, আর কোন মানুষকে তোমার অভীষ্টসাধনের যন্ত্র বলে মনে করবে না—এ বাণী দার্শনিক ক্যান্ট পাশ্চাত্ত্য দেশকে শুনিয়েছিলেন।

প্রাচীন ভারতের মহাকবি ও ঋষিগণের কণ্ঠেও আমরা মানবমহিমার কথা শুনতে পাই, কিন্তু একমাত্র ভারতীয় মানবতাবাদই দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। জীবকুলের ভেতর মানুষই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করে সর্ব বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে, আর এইখানেই মানুষের মহিমা। ভগবান তথাগত প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলেছেন : আত্মদীপ হয়ে বিহার করো, অনন্যশরণ হয়ে বিহার করো। জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ যে মুক্তিলাভের অধিকারী, ভারতবর্ষ যুগে যুগে এ কথা প্রচার করেছে। একমাত্র মানুষই সাধনা ও তপস্যার দ্বারা নবজন্ম লাভ করতে পারে, এইজন্যেই মানবজন্মকে দুর্লভ জন্ম বলা হয়েছে।

কিন্তু মানবেতর জীবের প্রতিও যে মানুষের কর্তব্য রয়েছে, সে কথাও আমাদের প্রতিদিন স্মরণ করা কর্তব্য। তাই এ দেশের শাস্ত্রকার গৃহস্থের জন্য পঞ্চ যজ্ঞের ব্যবস্থা দিয়েছেন। এই পঞ্চ যজ্ঞের ভেতর দুটো হচ্ছে—ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ পশু-পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীদের আহার্যদান ও নৃযজ্ঞ অর্থাৎ অতিথির সেবা। পঞ্চ যজ্ঞের ভেতর দিয়েই আমরা ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ এবং প্রাণিকুল ও মানবজাতির প্রতি আমাদের ঋণের কথা স্বীকার করি। 'নিজে বাঁচ ও অপরকে বাঁচতে দাও', 'Live and let others live'—এইটেই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের মূলসূত্র। এ যুগের শান্তিকামী মানুষের কণ্ঠেও আমরা 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' বা peaceful co-existence'-এর কথা শুনতে পাই। কিন্তু যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মিল নেই বা যাঁদের মতবাদের প্রতি আমাদের আস্থা নেই, তাঁদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান একটা গোঁজামিল মাত্র। কিন্তু অপরের মতবাদ গ্রহণ না করেও যে আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে পারি—ভারতবর্ষ আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে চাতুর্বর্ণ্যের কথা বলেছেন, তা হচ্ছে নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক চাতুর্বর্ণ্য, মানুষে মানুষে কৃত্রিম বৈষম্যকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেননি। সেকালের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে স্বীকার করেও তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, নারী-পুরুষনির্বিশেষে, জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রত্যেকেই পরমা গতি লাভ করতে পারে। অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে তিনি পৃথিবীর মানুষকে জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলেছেন :

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং'

গী. ৬।৫

'আত্মার দ্বারাই আত্মার উদ্ধারসাধন করবে।'

'নাত্মানমবসাদয়েৎ'

গী. ৬।৫

'আত্মাকে কখনও অবসন্ন হতে দেবে না।'

'Every man is the maker of his own destiny'—এটাই হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ও ভগবান বুদ্ধের বাণী।

কিন্তু শুধু মানবতার বাণী নয়, সর্বভূতে মৈত্রীভাবনার উপদেশও শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছেন। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি বলেছেন :

'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যো জনঃ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥'

গী. ৬।৩২

'হে অর্জুন, যে ব্যক্তি নিজের মত সকলকে দেখেন, অন্যের সুখ-দুঃখকে যিনি নিজের সুখ-দুঃখ বলে জ্ঞান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।'

কিন্তু মানুষে মানুষে যে গুণগত পার্থক্য দেখা যায়, সে সম্পর্কেও তিনি বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন। আবার পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্থিতপ্রজ্ঞ বা ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ বিবৃত করেছেন, তেমনি দৈবী সম্পদসমূহেরও পরিচয় দিয়েছেন। মহাপুরুষ খ্রীষ্টও পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেছেন, মানুষ যদি অনুতাপের অশ্রুজলে পাপ-পঙ্ক ধৌত করতে পারে, সে যদি শুদ্ধ-চিত্ত, ঈশ্বরে অনুরক্ত ও সর্ব মানবে প্রীতিমান হয়, তবে সে নবজন্ম লাভ করতে পারে। তাঁর উক্তি হচ্ছে—'Unless ye are born again, you cannot enter into the kingdom of God'. ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অধর্মের অভ্যুত্থান-কালে অতন্দ্রিত কর্মসাধনার ভিতর দিয়ে যে নতুন রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তুলেছেন তারও ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম। মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে তীব্র সাধনার দ্বারা ধীরে ধীরে নবজন্ম লাভ করা। মানুষ দেবতা হতে পারে, দৈবী সম্পদ লাভ করতে পারে, এটাই হচ্ছে মানুষের বিশেষ অধিকার।

শ্রীভগবান বলেছেন, সংসারে কোন কোন মানুষ দৈবী সম্পদ নিয়ে জন্মান,

আবার কোন কোন মানুষ আসুরী সম্পদ নিয়ে জন্মায়। এখানেও শ্রীভগবান মানুষে মানুষে স্বাভাবিক বা নৈসর্গিক বৈষম্য স্বীকার করেছেন। এই বৈষম্যের কারণ কি? পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিতদের ভিতর কেউ বা বলবেন, এই বৈষম্যের কারণ বংশধারা (heredity), কেউ বা বলবেন, এই বৈষম্যের কারণ হচ্ছে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিরসের (endocrine glands) আধিক্য বা অল্পতা। ফরাসী ডাক্তার লুই বার্ম্যান এ বিষয়ে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছেন।* আবার কেউ কেউ মনে করেন, মানুষে মানুষে যে পার্থক্য প্রকৃতিগত বলে মনে হয়, তা সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত নয়, কেন না, তারও মূলে রয়েছে পরিবেশ (environment); আর এই পরিবেশের ভিন্নতাই রয়েছে রামের সঙ্গে শ্যামের বা শ্যামের সঙ্গে যদুর পার্থক্যের মূলে। সে যাই হোক, মানুষে মানুষে বৈষম্য যে আছে, সে কথা তো স্বীকার করতেই হবে। উদ্ভিদের রাজ্যে যেমন কোনটা বনস্পতি, কোনটা বা ওষধি, কোনটা বীরুধ, কোনটা বা লতা, কোনটা তৃণ, কোনটা বা গুল্ম, মানুষের রাজ্যেও তাই। কোন কোন মানুষ বনস্পতির মতো মাথা তুলে দাঁড়ান, আর হাজার হাজার নরনারীকে সুশীতল ছায়াতলে বিশ্রাম দেন। এঁরাই মানবজাতিকে শ্রেয়ের পথ প্রদর্শন করেন।

আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে—মানুষ শূদ্র হয়ে জন্মে, সংস্কারের ফলে দ্বিজ হয়, বেদপাঠের ফলে বিপ্র হয় আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ব্রাহ্মণ হয়। এই ক্রমোন্নতি লাভ করতে হলে চাই সাধনা ও তপস্যা। মানুষকে দেবত্বের অধিকারী হতে হলেও সাধনার প্রয়োজন। সংসারে যারা অসুরপ্রকৃতি বা রাক্ষসপ্রকৃতি, তাদেরও নিরাশ হবার কোন কারণ নেই, যদি তাদের লক্ষ্য মহৎ হয়। মানুষ আজ যে সভ্যতার গর্ব করে, সে সভ্যতা হচ্ছে বর্বরতাকে লুকিয়ে রাখার ছদ্মবেশমাত্র। সভ্যতাভিমানী মানুষ অনেক ক্ষেত্রে মানুষ নয়, অসুর বা রাক্ষসমাত্র। দৈবী সভ্যতা ও আসুরী সভ্যতার পার্থক্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন।

দৈবী সম্পদ যিনি লাভ করেন, তিনি তো নরদেবতা। শ্রীকৃষ্ণ দৈবী সম্পদের এই তালিকা দিয়েছেন, ১. অভয় ২. সত্ত্ব-সংশুদ্ধি বা চিত্তের নির্মলতা ৩. আত্মজ্ঞান লাভের জন্য একনিষ্ঠতা ৪. যথাশক্তি যোগ্য পাত্রে দান ৫. দম বা

* কৌতূহলী পাঠক এ বিষয়ে তাঁর দু'খানা কৌতুকোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠ করে দেখতে পারেন—Personal Equation ও Glands Regulating Personality.

বহিরিন্দ্রিয়-সংযম ৬. যজ্ঞ অর্থাৎ পরের মঙ্গলের জন্যে বা ভগবানের প্রীতির জন্যে যা করা হয় ৭. স্বাধ্যায় বা শাস্ত্রপাঠ ৮. তপস্যা ৯. আর্জব বা সরলতা ১০. অহিংসা ১১. সত্য ১২. অক্রোধ ১৩. ত্যাগ ১৪. মনের প্রশান্তি ১৫. অপৈশুন অর্থাৎ কারও অগোচরে তার দোষ কীর্তন না করা ১৬. জীবে দয়া ১৭. অলোলুপত্ব অর্থাৎ বিষয়ে অনাসক্তি ১৮. মৃদুতা অর্থাৎ কর্কশ বচনে বা ব্যবহারে কারও মনঃপীড়া উৎপাদন না করা ১৯. হ্রী অর্থাৎ অন্যায় আচরণে লজ্জিত হওয়া ২০. অচাপল্য অর্থাৎ চঞ্চলতার অভাব বা স্থৈর্য ২১. তেজ বা তেজস্বিতা (নীরবে কোন অন্যায় বা অবিচার সহ্য না করে তার প্রতিকারের চেষ্টা করা অথবা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই হচ্ছে তেজের লক্ষণ) ২২. ক্ষমা অর্থাৎ শক্তি সত্ত্বেও অপকারীর অপকার না করা ২৩. ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য ২৪. শৌচ অর্থাৎ দেহ ও মনের শুদ্ধি (শুধু দেহের শুদ্ধি যথেষ্ট নয়, চিত্তশুদ্ধি হচ্ছে আসল লক্ষ্য, দেহের শুদ্ধি তার উপায় মাত্র। এখানেই দেহের শুদ্ধির বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সার্থকতা।* ২৫. অদ্রোহ অর্থাৎ শত্রুর প্রতি দ্রোহভাব পোষণ না করা এবং ২৬. নাতিমানিতা অর্থাৎ নিজেকে অতিমানী মনে না করা।

দৈবী সম্পদ লাভ করতে হলে প্রথমেই স্বার্থবুদ্ধি বা আত্মকেন্দ্রিকতা ত্যাগ করতে হবে। স্বার্থপর মানুষেরা লোভের বশবর্তী হয় এবং অনেক সময়ে নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাই শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ হচ্ছে, আমাদের জীবনের প্রতিটি কর্ম করতে হবে শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য অথবা লোকহিতার্থে অর্থাৎ আমাদের সমস্ত জীবনটাকে যজ্ঞে পরিণত করতে হবে। যে সমাজে স্বার্থপর লোকের সংখ্যা খুব বেশী, সে সমাজে নানা দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। পাশ্চাত্ত্য সমাজদর্শনের ভাষায় এরূপ সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত। সমাজদর্শনের যে অংশে সামাজিক ব্যাধির কারণ ও চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা হয়, তাকে বলে সামাজিক ব্যাধিবিজ্ঞান বা Social Pathology। সুস্থ বা স্বস্থ সমাজ গড়ে তুলতে হলে আমাদের সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জন দিতে হবে ও অপরের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে।

অসুর-প্রকৃতি লোকের সম্পর্কে শ্রীভগবান্ বলেছেন—

---

*ইংরেজিতে বলে 'Cleanliness is next to godliness' আবার বাইবেলে মহাপুরুষ খ্রীষ্ট বলেছেন—'Blessed are the pure in spirit, for they shall see God.'

এই শ্রেণীর লোকদের ধর্মে প্রবৃত্তি জন্মে না, অধর্ম থেকেও এরা নিবৃত্ত হয় না। এরা দাম্ভিক, অভিমানী, ক্রোধপরায়ণ ও নিষ্ঠুর হয়ে থাকে। এরা অজ্ঞান, এরা সত্যমিথ্যার ধার ধারে না; শৌচ বা আচার মানে না। এরা নাস্তিক, এরা কোনও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এরা এমন সকল কর্মের অনুষ্ঠান করে যা জগতের পক্ষে অকল্যাণজনক ও লোকক্ষয়কর। এদের কামনা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। বিষয়ভোগই এদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাই এরা কাম ও ক্রোধের অধীন হয়ে অন্যায়পূর্বক অর্থ সঞ্চয় করে। শত শত আশাপাশে এরা বদ্ধ হয়। সংসারে আশা বা বাসনাই হচ্ছে দুঃখের কারণ, তাই এদের দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। দম্ভ বশতঃ এরা মনে করে, 'আমি ভোগী, আমি শক্তিমান্, আমি বলবান্, আমি সুখী'। এমনি ভাবে এদের চিত্ত হয় বিভ্রান্ত, মোহজালে এরা হয় জড়িত, অহঙ্কারের বশীভূত হওয়াতে এরা কারও কাছে নম্র হতে পারে না। সংসারে মানুষের ধ্বংসের হেতু হচ্ছে কাম, ক্রোধ ও লোভ, অসুরপ্রকৃতি লোকেরা এই তিনটিরই অধীন হয়ে থাকে।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ তাঁর প্রিয় ভক্তের অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের লক্ষণ বলছেন। এরূপ পুরুষ কোনও প্রাণীকে দ্বেষ করেন না, তিনি সকলের বন্ধুস্বরূপ, তিনি দয়াবান্ অথচ মমতাশূন্য, তাঁর অহঙ্কার নেই, তিনি সুখে ও দুঃখে সমবুদ্ধি ও ক্ষমাশীল, তিনি সর্বদা সন্তুষ্ট, যোগযুক্ত ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ, ইন্দ্রিয়সমূহ তিনি জয় করেছেন, তিনি ভগবানে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করেছেন, কোনও প্রাণী থেকেই তিনি উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না অথবা কোনও প্রাণীরই তিনি উদ্বেগের কারণ হন না, তিনি প্রিয় বস্তুলাভে উৎসাহ প্রকাশ করেন না, তাঁর ঈর্ষ্যা নেই, ভয়ও নেই, সংসারের কোনও ঘটনাই তাঁকে চঞ্চল করতে পারে না, তিনি কর্ম সম্পাদন করার জন্যে কারও অপেক্ষা রাখেন না, দেহে ও মনে তিনি পবিত্র, তিনি আলস্য ত্যাগ করে নিপুণভাবে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন, কোনও বিষয়ে তাঁর পক্ষপাত নেই, তিনি কোনও ব্যাপারেই ব্যথিত হন না, ফলভোগের আশা ত্যাগ করে তিনি সকল কর্ম করেন, কার্যসিদ্ধি হলেও তিনি হৃষ্ট হন না, কাউকে তিনি দ্বেষ করেন না, প্রিয় বস্তুর অভাবে তিনি শোকে কাতর হন না, তিনি কোনও দ্রব্যেরই আকাঙ্ক্ষা করেন না, কিসে শুভ হবে আর কিসে হবে না, সেদিকে দৃষ্টি রেখে তিনি কর্ম করেন না, তাঁর কাছে শত্রু ও মিত্র সমান, শীতে ও উষ্ণে, সুখে ও দুঃখে, মানে ও অপমানে তিনি সমবুদ্ধি, কোন বিষয়েই

তাঁর আসক্তি নেই, নিন্দা ও প্রশংসা তাঁকে চঞ্চল করতে পারে না, তিনি বৃথা বাক্যালাপ করেন না, তিনি 'যদৃচ্ছালাভে' সন্তুষ্ট ও স্থিরবুদ্ধি, তাঁর কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই (অথবা কোন নির্দিষ্ট বাসস্থানে মমত্ববুদ্ধি নেই।)

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, এরূপ আদর্শ পুরুষ তো আমরা সংসারে কুত্রাপি দেখতে পাই না। উত্তরে বলা যায়, আমাদের আদর্শ যে পরিমাণে উন্নত হয়, সেই পরিমাণে আমরা মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব লাভ করি। কিন্তু আমাদের শুধু আদর্শ পুরুষের লক্ষণ জানলে চলবে না, আমাদের চাই চর্যা বা আচরণ, কারণ আচারবিহীন প্রচার নিষ্ফল, 'আপনি না কৈলে ধর্ম শেখানো না যায়'। মানুষ একসঙ্গে সকল গুণের অধিকারী হতে পারে না, তাই জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির করে আমাদের ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে। 'আমি আজ থেকে যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হব', 'আমি দেহে ও মনে পবিত্র হব', 'আমি আলস্য ত্যাগ করে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বসমাজের প্রতি আমার কর্তব্য পালন করব,' এমনি একটা ব্রত আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমরা নিজেরা দেবত্ব লাভ করব, অপরকেও শ্রেয়ের পথ প্রদর্শন করব, আর যারা অন্যায়কারী বা অত্যাচারী, যারা মানবতার বিরোধী অথবা স্বদেশ ও স্বজাতির শত্রু, তাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াব, তা হলেই ভগবদ্গীতার বাণীকে ধীরে ধীরে জীবনে সার্থক করে তুলতে পারব। মনস্বী স্বাইৎজার মানুষের প্রতি যে উচ্চতর কর্তব্যের (wider duty towards human beings) কথা বলেছেন এবং জোসেফ ম্যাটসিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে সংগ্রামের কথা বলেছেন, তা যেন ভগবদ্গীতার বাণীরই প্রতিধ্বনি।

১৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্মসংস্থাপনের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, সেই ব্রত উদ্যাপনের জন্য তাঁকে অনলস অতন্দ্রিত ভাবে কর্ম করতে হয়েছিল। তিনি ধর্মের ভিত্তির ওপর আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে ধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়, সে ধর্ম হচ্ছে মানুষের কল্যাণকর শাশ্বত নীতি। মহাভারতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হয়েছে—'যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেই ধর্ম, আর যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয়।' ('যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মঃ যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।') ভগবদ্গীতার শেষ শ্লোকে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

গী. ১৮।৭৮

যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, আর যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানে শ্রী, বিজয়, ভূতি বা সম্পদ ও ধ্রুব নীতি, এই আমার মত।

কিন্তু আদর্শ সমাজগঠনের দুটি বাধার কথাও ভগবান আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ধর্মের গ্লানি ঘটে তখনই ১. যখন সমাজের উচ্চস্তরে দুর্নীতি ও অনাচার প্রশ্রয় পায় এবং ২. নারীদের মধ্যে যখন আদর্শচ্যুতি ঘটে। আমরা দেখেছি, শ্রীভগবান বলেছেন—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন আচরণ করেন, অপর লোকেও (জনসাধারণও) তেমন আচরণ করে থাকে। তিনি যে প্রমাণ স্থাপন করেন, লোকে তারই অনুসরণ করে (৩।২১)।

লোক-সংগ্রহের জন্যে কিভাবে কর্ম করতে হয়, শ্রীভগবান তারও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'হে পার্থ, যদি আমি অতন্দ্রিত হয়ে কর্মে বর্তমান না থাকি, তবে মনুষ্যগণ সকল প্রকারেই আমার পথের অনুসরণ করবে।' (৩।২৩) 'এর ফলে সমাজে ঘটবে বিপর্যয়। আমার কর্মের ফলে লোকসমূহ উৎসন্ন যাবে, সমাজে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে ও প্রজাকুল ধ্বংস হবে' (৩।২৪)।

'সঙ্করস্য চ কর্তা স্যাম্'—এখন 'সঙ্কর' কথাটির দ্বারা 'বিপর্যয়', 'বিশৃঙ্খলা' প্রভৃতি অর্থও বোঝাতে পারে।

তথাকথিত শ্রেষ্ঠ বা উচ্চপদস্থ লোকদের ভিতর দুর্নীতি প্রবেশ করলে তা যে সমাজের সকল স্তরে দ্রুত ব্যাপ্ত হয়, তা আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করছি। মানুষের লোভ-ক্ষুধানল যতই ইন্ধন পায়, ততই তা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। অর্থলালসা অপরিমিত হয়ে উঠলে খাদ্য বা ঔষধের মত প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে ভেজাল দিতেও মানুষ কুণ্ঠা বোধ করে না। যখন মানুষ এই রকমের সমাজবিরোধী কর্মে লিপ্ত হয়, তখন রাষ্ট্রকে দণ্ডনীতির প্রয়োগ করতে হবে। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'দণ্ডো দময়তামস্মি' অর্থাৎ আমি দমনকারীদের দণ্ড (১০।৩৮)। পাপাচারীকে দমন করার যে সকল উপায় আছে, তার মধ্যে দণ্ডদানই শ্রেষ্ঠ, ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুস্পষ্ট অভিমত।

সমাজে নারীগণই চিরদিন ধর্মের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাঁদের জীবন

বিচার-বুদ্ধির দ্বারা যতটা চালিত হয়, তার চাইতে বেশী চালিত হয় সহজাত সংস্কারের দ্বারা। যে সমাজে পুরুষ ব্যভিচারী হয়, সে সমাজ হয়ত ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু যে সমাজে নারী ব্যভিচারিণী, সে সমাজের ভাগ্যে অতি দ্রুত ঘটে মহতী বিনষ্টি বা মহাবিনাশ। ইহা পক্ষপাতী পুরুষের সাম্যবাদ-বিরোধী উক্তি নয়, সমাজবিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতার ফল। সকল দেশেই দেখা যায় মহাযুদ্ধের পর সমাজে ব্যভিচারের স্রোত প্রবল হয়। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পরেও তাই ঘটেছিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে বংশেও অনাচার, অত্যাচার ও ব্যভিচারের স্রোত উৎকট ভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছিল, শ্রীকৃষ্ণ প্রধানতঃ এ বিষয়ে নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকাই গ্রহণ করেছিলেন।

সমাজের যখন চরম অধোগতি হয়, তখনই বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়, এটাই ছিল অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই অভিমত। স্বয়ং ভীষ্মদেব এমন কথাও বলেছেন যে বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলে বংশে পাপরাক্ষস, ক্লীব, অঙ্গহীন, মুক ও জড় উৎপন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—

'ক্ষত্রিয়স্য প্রমত্তস্য দোষঃ সংজায়তে মহান্।
অধর্মাঃ সংপ্রবর্ধন্তে প্রজাসঙ্করকারকাঃ॥'

মহাভারত, ৮৮।৩৬

রাজা যদি প্রজাশাসনে অনবহিত হন, তবে তাঁর গুরুতর দোষ জন্মে ও বর্ণসঙ্করকারক অধর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভগবদ্‌গীতার প্রথম অধ্যায়ে দেখতে পাই, মোহগ্রস্ত অর্জুন আশঙ্কা করছেন, যুদ্ধের ফলে কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহের পাতক ঘটবে, নারীরা দোষযুক্তা হবে এবং বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে। অর্জুন বলছেন—

'কুলক্ষয় হলে সনাতন কুলধর্মসমূহ বিনষ্ট হয়, ধর্ম নষ্ট হলে সমস্ত কুল অধর্মের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

'হে কৃষ্ণ, অধর্মের দ্বারা অভিভূত হলে কুলস্ত্রীগণ দূষিত হন, স্ত্রীগণ দোষযুক্ত হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।

'এরূপ সন্তান কুলনাশক ব্যক্তির ও কুলের নরক প্রাপ্তির হেতু হয়, ইহাদের পিতৃগণের নিশ্চয় পতন ঘটে।

'কুলঘ্নদিগের এই সব বর্ণসঙ্করকারী দোষের ফলে শাশ্বত জাতিধর্ম ও কুলধর্মের উচ্ছেদ ঘটে।

'হে জনার্দন, আমরা শুনেছি, যে সব মানুষ কুলধর্ম থেকে উচ্ছিন্ন হয়, তাদের সর্বদা নরকে বাস হয়ে থাকে।'

মহাভারতের যুগে সমাজের উচ্চ বর্ণের লোকদের পক্ষে নিম্ন বর্ণ থেকে কন্যাগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল না। স্বয়ং মনুও বলেছেন—'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'। তাই গীতায় অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ যে বর্ণসঙ্করের কথা বলেছেন, তা হচ্ছে ব্যভিচারের ফল। আমরা বলেছি, প্রত্যেক মহাযুদ্ধের পর এই ব্যভিচার অনিবার্য হয়ে ওঠে, কারণ, আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা মানুষ একেবারেই হারিয়ে ফেলে, সে তখন পশুর স্তরে নেমে যায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের ভিত্তিতে যে আদর্শ সমাজ গড়তে চেয়েছেন, সে সমাজে জ্ঞানী মানুষেরাও অজ্ঞান ব্যক্তিদের বুদ্ধিভেদ জন্মাবেন না। তাই তাঁদেরও যথাসাধ্য শাস্ত্রবিধি ও লোকাচার পালন করতে হবে। মানুষকে শাস্ত্র ও যুক্তির আলোকে পথ চলতে হবে। স্মৃতিশাস্ত্র বলেছেন—'কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করে কর্তব্য নির্ণয় করবে না, কেন না, যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি হয়'।

'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥'

শ্রীকৃষ্ণ যুক্তিহীন বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই তিনি জ্ঞানী ও জিজ্ঞাসুর প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তিনি এ কথাও জানতেন যে যুক্তিরও কোনও প্রতিষ্ঠাভূমি নেই। আমি হয়ত যুক্তির দ্বারা একটি বিষয় স্থাপন করলাম, কিন্তু আমার প্রতিপক্ষ হয়ত প্রবলতর যুক্তির দ্বারা তা একেবারে নস্যাৎ করে দিলেন। আবার আজ যা আমার কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে, কাল হয়ত তা একেবারে যুক্তিহীন বলে মনে হতে পারে। তা ছাড়া মানুষ তো যুক্তির দ্বারা পরম তত্ত্বকে জানতে পারে না, তার জন্যে চাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাহীন মানুষ জ্ঞানলাভও করতে পারে না। এইজন্য গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলেছেন: 'যারা অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা তারা বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল আর না আছে সুখ।' এইখানেই শাস্ত্রবিধি পালনের সার্থকতা। লোক-সংগ্রহের জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরও শাস্ত্রের অনুসরণ করা উচিত। মহাভারতে দেখা যায়,

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই শাস্ত্রবিধি ও লৌকিক আচার পালন করেছেন। অথচ তিনি অর্জুনকে ভ্রাতৃবধ থেকে নিবৃত্ত হবার জন্যে যে সব উপদেশ দিয়েছেন, তাতে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে শ্রুতিতে সর্বদা ধর্মের নির্দেশ থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে: যাতে লোকহিত বা সর্বভূতের কল্যাণ হয়, তাই ধর্ম।

শ্রীকৃষ্ণ জানতেন, অন্ধভাবে শাস্ত্রের দাসত্ব করা যেমন ধর্ম নয়, স্বেচ্ছাচারিতাও তেমনি ধর্ম হতে পারে না। মানুষ সংযমের শাসনে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে বলেই সে পশু থেকে পৃথক। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলেছেন: 'যে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে যথেচ্ছাচারী হয়, সে না পায় সিদ্ধি, না পায় সুখ, না পায় পরা গতি।

'কোন্‌টা তোমার পক্ষে কর্তব্য আর কোন্‌টাই বা অকর্তব্য, সে বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ, শাস্ত্রের বিধান জেনেই সংসারে তোমার কর্তব্যকর্ম করা উচিত।'

'যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥'

গী. ১৬।২৩-২৪

যারা স্বৈরাচারী সহজেই তাদের বুদ্ধিভ্রংশ হয়। ভগবান মনু বলেন—সকল ইন্দ্রিয়ের ভেতর যদি একটি ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়, তাতেই লোকের বুদ্ধিভ্রংশ হয়, যেমন চর্মময় পাত্রের একটিমাত্র ছিদ্র দিয়ে সমস্ত জল নিঃসৃত হয়।

'ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্‌।
ততোঽস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্‌॥'

শাস্ত্র মানেই হচ্ছে শাসনবাক্য। অধিকারিভেদে নানা শাস্ত্র—ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র। শাস্ত্রবচন হলেই তা যুক্তিবিরোধী হবে কেন? বরং যথার্থ শাস্ত্রবচন যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াই তো স্বাভাবিক। রাজা রামমোহন তাই শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়ের কথা বলেছেন। আমরা আজ শাস্ত্রবচনে অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করে উচ্ছৃঙ্খল ও স্বৈরাচারী হয়ে পড়েছি। তাই সমাজের সকল স্তরেই আদর্শ মানুষ দুর্লভ হয়ে পড়েছে। গুরু, পুরোহিত, শিক্ষক, চিকিৎসক সকলেই আদর্শভ্রষ্ট, অনেকে শুধু জীবিকার্জনের জন্য সাধুর

বেশধারী। আমরা যে পরিমাণে ধর্মের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছি, যে পরিমাণে আমাদের মধ্যে লোভক্ষুধানল প্রজ্বলিত হচ্ছে, সেই পরিমাণেই আমরা অন্তরের দিক থেকে 'দেউলে' হয়ে পড়ছি। ফলে সমাজের এক স্তরে দেখছি ধনসম্পদের প্রাচুর্য, অন্য স্তরে দেখছি তীব্র দারিদ্র্য। আমাদের যদি যথার্থ কল্যাণ লাভ করতে হয়, তবে আমাদের শাস্ত্রবিধির অনুসরণ করে শান্ত সংযত জীবন যাপন করতে হবে। যুগোপযোগী প্রয়োজনকে আমরা স্বীকার করে নেব কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় যা শাশ্বত, যা সনাতন, যা নিখিল বিশ্বের হিতকর, তার ওপর ভিত্তি করেই আমাদের গড়ে তুলতে হবে নতুন যুগের নতুন সমাজ।

১৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করার সময় আমরা 'জগদ্‌গুরু' এই বিশেষণ পদটির প্রয়োগ করে থাকি। আমরা প্রতিদিন ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে উচ্চারণ করে থাকি—

'বসুদেবসুতং দেবং কংসচানূরমর্দনম্।
দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্॥'

গীতা-ধ্যান : ৫

এখানে 'জগদ্‌গুরু' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং পূর্ণ মানবতার আদর্শ, তাঁর ভেতর যে নানা বৃত্তি সম্যক অনুশীলিত ও সমঞ্জসীভূত, এটা মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকপোলকল্পিত নয়, সমগ্র মহাভারতেই এর প্রমাণ রয়েছে। আবার তিনি যে সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছিলেন এবং খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে মহাভারতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এটাও কবি নবীনচন্দ্রের স্বকপোলকল্পিত নয়, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-রচিত মহাকাব্য থেকেই এ কথা প্রতিপন্ন করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ গীতামৃত পরিবেশন করেছিলেন শুধু অর্জুনকে মোহপ্রবুদ্ধ করার জন্য নয়, সর্ব দেশের সর্ব যুগের সকল মানবের কল্যাণের জন্য। সাগরে যেমন নানা নদীর জলধারা এসে মিলিত হয়, তেমনি তাঁর মধ্যে বহু বিচিত্র ভাবধারা এসে মিলিত হয়েছিল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সাম্যবাদ প্রচার করেছেন, তার সঙ্গে অধিকারবাদের কোনও বিরোধ নেই। মানুষে মানুষে কৃত্রিম বৈষম্যকে অস্বীকার করে ও নৈসর্গিক বৈষম্যকে স্বীকার করে তিনি নতুন 'ধর্মরাষ্ট্র' গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

তিনি যে সাম্যবাদের আদর্শ স্থাপন করেছেন, সেটা অর্থনৈতিক সাম্যবাদ নয়, সেটা হচ্ছে একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বা উপলব্ধি। এ সাম্যবাদের মূলে রয়েছে সর্বভূতে আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন। অবশ্য, এ উপলব্ধি কঠোর সাধনা বা তপস্যার ভেতর দিয়েই লাভ করতে হয়। কোন মানুষ এ আদর্শে পৌছতে পারে কিনা, এ নিয়েও তর্ক হতে পারে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (ও ভগবান তথাগত) সর্বভূতে মৈত্রী-ভাবনার কথাও বলেছেন। এই মৈত্রী-ভাবনাকে আমরা দৈনন্দিন প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি—

'ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥'

আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, মুক্তিও কামনা করি না, আমি প্রার্থনা করি, দুঃখতপ্ত প্রাণীদের আর্তিনাশ হোক।

এই মৈত্রী-ভাবনার আদর্শ মানবতার আদর্শের চাইতেও বড়। ভগবান যীশু ইহুদীদের মধ্যে মানবতার আদর্শ প্রচার করেছিলেন। ইহুদীরা মনে করতেন, তাঁরা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত (chosen people), আর তাঁদের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হচ্ছে—'বন্ধুকে ভালবাসবে ও শত্রুকে ঘৃণা করবে' (Love thy friend but hate thine enemy), ভগবান যীশু প্রচার করলেন, 'তোমার প্রতিবেশীর প্রতি আত্মবৎ প্রীতিমান হবে' (Love thy neighbour as thyself)। মনুষ্যেতর প্রাণীদের প্রতি আচরণ-সম্পর্কে মহামানব খ্রীষ্ট কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশ দেননি বটে কিন্তু এ কথা হয়ত সত্য যে, যাঁরা সর্বমানবে প্রীতিসম্পন্ন, তাঁরা ধীরে ধীরে সর্বভূতের প্রতিও মৈত্রী-ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। সেণ্ট ফ্রান্সিস্ (St. Francis of Assissi) প্রভৃতি সাধকগণ এর দৃষ্টান্ত।

কিন্তু ভগবান তথাগত বা মহর্ষি পতঞ্জলি যে অহিংসার আদর্শ প্রচার করেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সে আদর্শ প্রচার করেননি। তিনি যে ধর্ম-সংস্থাপন করেছিলেন, তার মূল কথা হচ্ছে—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। যে রাজা বা যে ক্ষত্রিয় এই ধর্ম পালন না করেন, তিনি স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হন। যেখানে দুর্বৃত্ত বা অত্যাচারীর সঙ্গে সন্ধি-স্থাপনের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়, সেখানে ধার্মিক রাজা ধর্মরক্ষার জন্যেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন, এটাই হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। শুধু তাই নয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্ষাত্রধর্মের এক মহত্তম

আদর্শও আমাদের কাছে স্থাপন করেছেন। হিংসাত্মক বা ক্রূর কর্ম করেও মানুষ কিভাবে পাপে লিপ্ত হয় না, সে উপদেশও তিনি আমাদের দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—'যাঁর অহঙ্কার বা কর্তৃত্ববোধ নেই, বুদ্ধি যাঁর লিপ্ত হয় না, তিনি এই সকল লোক হত্যা করলেও হত্যা করেন না, এই হত্যা তাঁর বন্ধনের কারণ হয় না।'

'যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥'

গী. (১৮।১৭)

মহাত্মা গান্ধী এই শ্লোকটির যে ব্যাখ্যা করেছেন, তার সঙ্গে কিন্তু সমগ্র গীতার মূলগত ভাবের কোনও সঙ্গতি নেই। এই শ্লোকের 'টিপ্পনী'তে তিনি বলেছেন—

'উপরে উপরে দেখতে গেলে এই শ্লোক মানুষকে ভুলে ফেলতে পারে। গীতার অনেক শ্লোক কাল্পনিক আদর্শ অবলম্বনকারী। সেই আদর্শের হুবহু নমুনা জগতে মেলে না। রেখা-গণিতের কাল্পনিক আদর্শের আবশ্যকতা যেমন আছে, তেমনি ধর্ম-ব্যবহারেও ওই প্রকার আদর্শের আবশ্যকতা আছে। সেই-জন্যে এই শ্লোকের অর্থ এরূপ করা যায়—যার অহংজ্ঞান ভস্মীভূত হয়ে গেছে ও যার বুদ্ধিতে লেশমাত্র মলিনতা নেই, সে যদি সারা জগৎকে মারে তো মারুক। কিন্তু যার মধ্যে অহংজ্ঞান নেই, তার শরীরও নেই। যার বুদ্ধি বিশুদ্ধ, সে ত্রিকালদর্শী। এ রকম পুরুষ তো কেবল এক ভগবান। তিনি কর্ম করেও অকর্তা, হত্যা করেও অহিংসক। সেই হেতু মানুষের কাছে হত্যা না করাই শিষ্টাচার ও শাস্ত্রসম্মত একমাত্র মার্গ।'

মহাত্মাজী এখানে গীতার এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটির যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা যে শাস্ত্রসম্মত নয়, তা বলাই বাহুল্য, কারণ দণ্ডনীতির প্রয়োগ ভিন্ন; দুর্বৃত্তের দমন ভিন্ন এবং যারা অন্যায়ভাবে পররাজ্যলিপ্সু, তাদের সঙ্গে সংগ্রাম ভিন্ন রাষ্ট্ররক্ষা তথা ধর্মরক্ষাই সম্ভবপর নয়।

মহাভারতের শান্তিপর্বে একপ্রকার যজ্ঞের উল্লেখ আছে, তার নাম সংগ্রাম-যজ্ঞ। (পঞ্চনবতিতম অধ্যায়, ইন্দ্রাম্বরীষ-সংবাদ।) অন্যান্য যজ্ঞের মত এ যজ্ঞেও কর্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করতে হয়, তা হ'লেই এ যজ্ঞ বন্ধনের কারণ হয় না। যাঁরা অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বীরের মত সংগ্রাম করেন, তাঁরাই

এই যজ্ঞের যাজ্ঞিক। আমাদের শাস্ত্র বলেন, যাঁরা এই যজ্ঞে আত্মবিসর্জন দেন, তাঁরা অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্ জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥'

গী. ২।৩৭

মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—

'ধর্মেণ নিধনং শ্রেয়ো ন জয়ঃ পাপকর্মণা।
নাধর্মশ্চরিতো রাজন্! সদ্যঃ ফলতি গৌরিব॥'

মহা. ৯২।২২

ধর্মযুদ্ধে মৃত্যুও বরণীয়, অধর্মযুদ্ধে জয়ও শ্রেয় নয়। তবে অধর্ম আচরণ করলে তা গাভীর মত সদ্য ফল উৎপাদন করে না।

ভীষ্মদেব বলেন, পাপাত্মা লোক পাপ কর্মের দ্বারা প্রথমে উন্নতি লাভ করলেও পরিণামে বিনষ্ট হয়।

'মূলানি চ প্রশাখাশ্চ দহন্ সমধিগচ্ছতি।
পাপেন কর্মণা বিত্তং লব্ধা পাপঃ প্রহৃষ্যতি॥'

মহা. ৯২।২৩

অগ্নি যেমন বৃক্ষের মূল থেকে প্রশাখা পর্যন্ত দগ্ধ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পাপাচারী লোক তেমনি পাপ কর্মের দ্বারা ধন লাভ করে আনন্দিত হয়।

'স বর্ধমানঃ স্তেয়েন পাপঃ পাপে প্রসজ্জতি।
ন ধর্মোঽস্তীতি মন্বানঃ শুচীনবহসন্নিব॥'

মহা. ৯২।২৪

ক্রমে সেই পাপাচারী চৌর্যের দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকে, ধর্ম নেই মনে করে সে যেন ধার্মিক লোকদের উপহাস করতে থাকে এবং পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়।

'মহাদৃতিরিবাধ্মাতঃ স্বকৃতে নৈব বর্ততে।
ততঃ সমূলো হ্রিয়তে নদীকূলাদিব দ্রুমঃ॥'

মহা. ৯২।২৬

সেই পাপাচারী বায়ুপূর্ণ বিস্তৃত চর্মকোষের মত ঐশ্বর্যে পূর্ণ হতে থাকে,

সে কোনও পুণ্যকর্মেই প্রবৃত্ত হয় না। তারপর জলস্রোত যেমন নদীকূল থেকে সমূলে বৃক্ষকে হরণ করে, তেমনই পাপ সেই পাপাত্মাকে সবংশে নিরয়গামী করে।

'অথৈনমভিনিন্দন্তি ভিন্নং কুম্ভমিবাশ্মনি।
তস্মাদ্ধর্মেণ বিজয়ং কোষং লিপ্সেত ভূমিপঃ॥'

তারপর শিলাভগ্ন কলসীর মত সকলেই সেই পাপাচারীর নিন্দা করে। অতএব রাজা ধর্মকে আশ্রয় করেই বিজয় ও ধন লাভ করতে ইচ্ছা করবেন।

ঈর্ষা, দম্ভ ও লোভের বশবর্তী হয়ে যাঁরা পররাজ্য গ্রাস করতে চান, শ্রীকৃষ্ণের মতে তাঁরা হচ্ছেন অসুর-প্রকৃতির লোক। এঁরা ন্যায় অনুসারে দণ্ডনীয়। যুদ্ধ যেখানে অনিবার্য হয়ে ওঠে, সেখানে যে ক্ষত্রিয় সংগ্রামে বিমুখ হন, তিনি ভীরু কাপুরুষ, এরূপ ক্ষত্রিয় স্বধর্মভ্রষ্ট, আর যাঁরা মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করে বীরের মত দুর্জয় সংগ্রামে রত হন, সেই রাজা বা ক্ষত্রিয় হচ্ছেন স্বধর্মের রক্ষক। সেক্‌স্‌পীয়র সত্যই বলেছেন, ভীরুরা মরে যাবার পূর্বে বহুবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু বীরেরা শুধু একবার মৃত্যুর আস্বাদ লাভ করে।

'Cowards die many times before their deaths
The valiant never taste of death but once.'

Shakespeare

শ্রীকৃষ্ণ মহাসমন্বয়াচার্য। তিনি মানুষের রুচিবৈচিত্র্যকে স্বীকার করেও সকলের জন্যেই পরম আশার বাণী শুনিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কালে ভারতবর্ষে নানা সাধনার ধারা, নানা উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছিলেন, সেখানে সকলেরই চিন্তার স্বাধীনতা আছে, কর্মের স্বাধীনতা আছে, রুচি অনুসারে উপাসনারও অধিকার আছে। অবশ্য, কারও কর্মের ফলে যদি সমাজে বিশৃঙ্খলা বা বিপর্যয় দেখা দেয়, তবে তা হবে বিকর্ম। রাষ্ট্র এরূপ বিকর্মকারীকে সংযত করবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-পরিকল্পিত রাষ্ট্রে কেউ কারও ধর্মাচরণে বাধা দেবে না, কারণ অধিকারভেদ সে রাষ্ট্রে স্বীকৃত। এক হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ-পরিকল্পিত রাষ্ট্রও secular state, আবার অন্য হিসাবে একে কিছুতেই secular বলা চলে না; একে বলা যায় ধর্মরাষ্ট্র, কিন্তু এ ধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলেছেন—'আমাকে যারা যেভাবে আশ্রয় করে, আমি তাদের সেইভাবেই ভজনা করি। হে পার্থ, মনুষ্যেরা সর্বপ্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করে।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥'

গী. ৪।১১

শ্রীকৃষ্ণ কখনও এমন কথা বলেননি যে, কোনও একটি বিশিষ্ট সাধনমার্গ অবলম্বন না করলে মানুষ পরম গতি প্রাপ্ত হতে পারবে না। অধিকারভেদে সাধনার ভেদ তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতার, রাজস ব্যক্তিগণ যক্ষরক্ষাদির ও তামস প্রকৃতির লোকগণ ভূতপ্রেতের পূজা করেন। (এই সমস্ত বিভিন্ন পূজার পদ্ধতি শ্রীকৃষ্ণের সময়ে প্রচলিত ছিল। তিনি কারও বুদ্ধিভেদ জন্মাননি, কারণ, তিনি জানতেন, সকলেই একদিন চরম লক্ষ্যে পৌছবেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদ্ শ্রীকৃষ্ণ মানুষের রুচিবৈচিত্র্য ও প্রকৃতিভেদকে স্বীকৃতি দান করেছেন।) গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এই কথাই বলা হয়েছে।—

'যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥'

গী. ১৭।৪

মানুষ যে ভাবেই ভগবানের উপাসনা করুন অন্তরের ভক্তি তাঁকে অর্পণ করতেই হবে। যিনি সর্ব কর্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করেন, তিনিই ধন্য। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে আমাকে পত্র পুষ্প ফল জল অর্পণ করে, সেই নিয়তচিত্ত ব্যক্তির ভক্তির দ্বারা উপহৃত দ্রব্যসকল আমি ভোজন করি।

'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥'

গী. ৯।২৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অব্যক্তের উপাসনার কথাও বলেছেন। কিন্তু তাঁর মতে এ পথ অত্যন্ত কঠিন। তিনি বলেছেন—যাঁরা অব্যক্তের উপাসনা করেন, তাঁদের অধিকতর ক্লেশ স্বীকার করতে হয়, কারণ দেহধারী মানুষের পক্ষে অব্যক্তের উপলব্ধি অত্যন্ত কঠিন।

'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥'

গী. ১২।৫

শ্রীকৃষ্ণ প্রাচীন বা তৎকালীন সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চাননি। তিনি এ কথা কখনও বলেননি, নারী ও পুরুষে সকল ক্ষেত্রেই সমান অধিকার, আর বর্ণভেদই সমাজে দুর্গতির কারণ, সুতরাং এই ভেদকে লুপ্ত করে দাও। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন, ঐক্য আর একাকারত্ব এক কথা নয়, আর কোনও প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলাই কল্যাণকর নয়। অথচ তিনি হীন, পতিত, উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত সকলকেই মাভৈঃ বাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন—'অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে, তাকে সাধু বলেই গণনা করবে, কারণ, তার সাধু সংকল্পের উদয় হয়েছে। সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায় এবং চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, এ কথা নিশ্চয় জেনো।'

'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥'

গী. ৯।৩০-৩১

শ্রীকৃষ্ণ আবার বলছেন—যাঁরা নীচকুলে জন্মেছেন অথবা যারা স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র তারাও আমার আশ্রয় গ্রহণ করলে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। পুণ্যবান ব্রাহ্মণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণের আর কথা কি! অতএব এই অনিত্য ও সুখহীন সংসারে আমার ভজনা কর।

'মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥'

গী. ৯।৩২-৩৩

এ প্রসঙ্গে মনস্বী গিরীন্দ্রশেখর বসুর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

'শ্রীকৃষ্ণেব যুগে সাধারণের ধারণা ছিল যে নীচ-কুলোৎপন্ন ব্যক্তি, স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতির মুক্তিলাভ হয় না, কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই মুক্তির অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণের কোন জাত্যভিমান বা স্ত্রীলোকের প্রতি অবজ্ঞা নাই।'

বাস্তবিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে ভাঙতে আসেননি, তিনি এসেছিলেন তাকে পূর্ণতা দান করতে। এরই নাম শ্রীকৃষ্ণের ধর্মসংস্থাপন। পরবর্তীকালে ভগবান যীশু যে কথা বলেছিলেন, তা যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই মর্মবাণী। সে বাণী হচ্ছে—

'I am not come to destroy but to fulfil.'

St. Mathew, New Testament

১৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যজীবন ও কর্মের কথা যতই চিন্তা করা যায় ততই বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি কপিল সম্পর্কে একদিন স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, কপিল মুনি হচ্ছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদ্ (Kapila is the greatest psychologist that the world has ever produced)। কপিল মুনির শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীভগবান স্বয়ং স্বীকার করেছেন, তিনি বলেছেন—'আমি মুনিদের মধ্যে কপিল মুনি' ('মুনীনাং কপিলো মুনিঃ')। কিন্তু তবু এ কথা মনে হয় যে, মহাভারতে যে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তিনি একদিকে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী, অপর দিকে শ্রেষ্ঠ রাজনীতি-কুশলী ও সমরনায়ক, একদিকে মানবমনের অন্তস্তলদর্শী মনোবিজ্ঞানী, অপর দিকে শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলসূত্রের আবিষ্কারক। এ যুগেও প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্‌কে শ্রীকৃষ্ণের একটি উক্তি স্মরণ রাখা উচিত। সেটি হচ্ছে—স্বধর্মের আচরণই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণ বলেন—'সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত পরধর্মের চেয়ে আংশিকরূপে আচরিত স্বধর্মও শ্রেয়, আর স্বভাবনির্দিষ্ট কর্মের অনুষ্ঠানে মানুষ কখনো পাপগ্রস্ত হয় না।' আমরা সংসারে প্রত্যেক মানুষের ভিতর রুচিভেদ ও প্রকৃতিভেদ দেখতে পাই। এই রুচিভেদ ও প্রকৃতিভেদের কথা স্মরণ রেখেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, যে শক্তি আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বা নিহিত রয়েছে, তাকে ব্যক্ত করে তোলা। স্বামীজী বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের ভিতর যে পূর্ণতা রয়েছে, তাকে প্রকাশিত

করা (Education is the manifestation of the Perfection already in man)। আর স্বামীজীর মতে ধর্মচর্চার উদ্দেশ্য হচ্ছে—আমাদের ভিতরে যে দেবত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাকে প্রকাশিত করে তোলা (Religion is the manifestation of the Divinity already in man)। যিনি আদর্শ শিক্ষাব্রতী, তাঁকে মানুষে মানুষে গুণগত বা নৈসর্গিক বৈষম্য স্বীকার করতেই হবে। তিনি কারও বুদ্ধিভেদ জন্মাবেন না। মানুষে মানুষে অধিকারের তারতম্য স্বীকার করে নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে শিষ্যের মানস-মুকুলকে বিকশিত করে তুলবেন। তন্ত্রশাস্ত্রও মানুষকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন ও গুণভেদে মানুষের জন্যে পৃথক আচারের নির্দেশ দিয়েছেন। ভগবদ্‌গীতায় 'স্বধর্ম' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ',—এ কথার গভীর ইঙ্গিত পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে প্রণিধানযোগ্য।

আমরা দেখেছি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে চাতুর্বর্ণ্যের কথা বলেছেন, তা গুণগত, বংশগত নয়। যে কোন শূদ্র, বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় কর্মের দ্বারা ও গুণের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারেন, এ কথা শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেছেন, তবে সমাজরক্ষা বা রাষ্ট্ররক্ষার জন্যে যে এই চাতুর্বর্ণ্যের প্রয়োজন আছে, এ কথা ঘোষণা করবার জন্যেই তিনি বলেছেন—

'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।'

গী. ৪।১৩

ভগবদ্‌গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্মসকল স্বভাবজাত গুণের দ্বারা বিভক্ত।

'ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥'

গী. ১৮।৪১

'শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য স্বভাবজ ব্রাহ্মণকর্ম (অর্থাৎ যাঁরা এই সকল গুণের অধিকারী তাঁরাই ব্রাহ্মণ)। শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন না করা, দান ও প্রভুত্বের ইচ্ছা (love of domination over others) স্বভাবজ ক্ষাত্রকর্ম (অর্থাৎ যাঁরা এই সকল গুণের অধিকারী, তাঁরাই ক্ষত্রিয়)। কৃষিকর্ম, পশুদের পালন ও রক্ষণ এবং বাণিজ্য, স্বভাবজ বৈশ্যকর্ম আর পরিচর্যা হচ্ছে স্বভাবজ শূদ্রকর্ম।

'শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥
কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥'

গী. ১৮।৪২-৪৪

চাতুর্বর্ণ্যের কর্তব্য সম্পর্কে ভগবান মনু যা বলেছেন, তাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন—বিধাতা ব্রাহ্মণের জন্য ছয়টি কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন, যথা—অধ্যয়ন অর্থাৎ বেদপাঠ, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ। সংক্ষেপে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে—প্রজাবর্গের রক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি। বৈশ্যদিগের কর্তব্য হচ্ছে—পশুদিগের রক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুসীদ (সুদে টাকা লগ্নী করা) ও কৃষিকর্ম। মনু শূদ্রদের জন্যে একটি মাত্র কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে—অসূয়াশূন্য হয়ে ত্রিবর্ণের সেবা।

'অধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥'

এখানে লক্ষণীয় যে, মনুসংহিতায় বেদপাঠ, যজ্ঞ ও দান ত্রিবর্ণের জন্যেই বিহিত হয়েছে, কিন্তু ভগবদ্গীতায় এরূপ কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। তবে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বর্জনীয় নয়, করণীয়। কারণ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যার ফলে মনীষীদের চিত্তশুদ্ধি হয়।

'যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥'

গী. ১৮।৫

শ্রীকৃষ্ণের মতে নিত্যকর্মও কারও পক্ষে কোনও অবস্থায় বর্জনীয় নয়।

আর একটি কথাও লক্ষণীয়। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, শূদ্র কখনও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করবে না, কিন্তু ভগবদ্গীতায় এরূপ কোনও উক্তি নেই।

ভগবদ্গীতার ন্যায় বিষ্ণুপুরাণেও স্বধর্ম-পালনের নির্দেশ আছে। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে, স্বধর্ম-পালনের দ্বারাই বিষ্ণুর আরাধনা হয়ে থাকে।

'ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ ধরণীপতে।
স্বধর্মতৎপরো বিষ্ণুমারাধয়তি নান্যথা॥'

বিষ্ণুপুরাণ ৩।৮।১২

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সর্বপ্রকার আতিশয্য বর্জন করে মধ্যপন্থা অনুসরণের উপদেশ দিয়েছেন। সপ্তদশ অধ্যায়ে দেখতে পাই, উগ্র তপস্যার দ্বারা দেহকে কৃশ করা শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত ছিল না। তিনি বলেছেন, মানুষমাত্রেই শাস্ত্রবিধি এবং সামাজিক রীতিনীতির অনুসরণ করে চলবে। কেউ স্বৈরাচারী হয়ে অপরের বুদ্ধিভেদ জন্মাবে না। সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥'

গী. ১৭।৫-৬

'যারা দাম্ভিক ও অহঙ্কারী, যারা কাম, রাগ ও বলান্বিত, সেই সব মূঢ়চেতা ব্যক্তি দেহস্থিত ভূতগ্রামকে এবং অন্তঃশরীরে অবস্থিত আমাকেও কৃশ করে অশাস্ত্রীয় উগ্র তপস্যায় রত হয়, তাদের অসুরবুদ্ধি বলে জানবে।'

দেহস্থিত ভূতগ্রাম বলতে এখানে পঞ্চ মহাভূতকে বোঝাচ্ছে। পঞ্চ মহাভূত হচ্ছে—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম।

* * * *

আমরা দেখেছি শ্রীকৃষ্ণ মানুষকে প্রকৃতি অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—ত্রিগুণতত্ত্বের সাহায্যে জগদ্-ব্যাপারের ব্যাখ্যান ভারতীয় মনীষার এক অত্যদ্ভুত আবিষ্কার। গীতার সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায় এই ত্রিগুণতত্ত্বের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের শাস্ত্রে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহারের কথা আছে। ব্যাপক অর্থে 'আহার' কথাটার অর্থ হচ্ছে আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা আহরণ করি (অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) এই ব্যাপক অর্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও আহার শব্দের প্রয়োগ করেছেন। যথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে—

'বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥

গী. ২।৫৯

সংকীর্ণ অর্থে 'আহার' শব্দের অর্থ খাদ্য। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে সংকীর্ণ অর্থেই আহাব শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। সকলেই জানেন, শ্রুতির (উপনিষদের) একটি বিখ্যাত উক্তির (আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ) ব্যাখ্যানে আচার্য শঙ্কর ব্যাপক অর্থে ও রামানুজাচার্য সংকীর্ণ অর্থে 'আহার' কথাটির প্রয়োগ করেছেন।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥'

গী. ১৭।৮

যে খাদ্যের দ্বাবা আয়ু, সত্ত্বগুণ, দৈহিক শক্তি, মনোবল, স্বাস্থ্য, সুখ ও প্রীতি বর্ধিত হয়, যে খাদ্য রসাল, স্নেহযুক্ত; সারবান ও রুচিকর, সেই খাদ্য সত্ত্বগুণী ব্যক্তিদের প্রিয়।

'কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥'

গী. ১৭।৯

কটু (ঝাল), অম্ল, লবণাক্ত, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ (স্নেহবর্জিত) ও বিদাহী (জ্বালাকর) আহার্য রাজস ব্যক্তিগণের প্রিয়, এই সকল খাদ্য পরিণামে দুঃখ, শোক ও রোগ জন্মায়।

'যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥'

গী. ১৭।১০

যে খাদ্য বাসী, শুষ্করস, দুর্গন্ধযুক্ত, বিকারপ্রাপ্ত, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, তা হচ্ছে তামস লোকদের প্রিয়।

আমরা যা আহার করি তার স্থূল অংশে আমাদের দেহ ও সূক্ষ্ম অংশে আমাদের মন গঠিত হয়। এইজন্য উপনিষদে মনকে বলা হয়েছে অন্নময়।

ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ খাদ্যকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এতে তাঁদের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে আজও এক রকম অজ্ঞ বললেই চলে। শ্রীভগবান দেখিয়েছেন, প্রকৃতিভেদে কতকগুলো আহার আমাদের প্রিয় হয়, তাই কোন্ কোন্ খাদ্য আমাদের প্রিয়, তা পর্যবেক্ষণ করে আমাদের প্রকৃতি নির্ণয় করা চলে। আহার সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন, তা একালের বৈজ্ঞানিকদেরও প্রনিধানযোগ্য।

লক্ষ্য করতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে কোন বিশেষ খাদ্যের উল্লেখ করেননি, তিনি কয়েকটি নীতির উল্লেখ করেছেন মাত্র। তিনি নিরামিষাহারের বিধি দেননি বা আমিষাহারও নিষিদ্ধ করেননি। কারণ তিনি জানতেন—দেশভেদে, ঋতুভেদে, পরিবেশের ভিন্নতায়, বৃত্তিভেদে আহারের তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। তাই কয়েকটি মূল নীতি স্মরণে রেখে আমাদের আহার্য নির্বাচন করা উচিত, এ কথা বলাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, গুণভেদে আহার যেমন তিনপ্রকার, তেমনি যজ্ঞ, তপস্যা ও দানও তিনপ্রকার। শ্রীকৃষ্ণ 'যজ্ঞ' কথাটিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। যে কোন মহৎ বা লোকহিতকর কর্মকেই 'যজ্ঞ' বলা চলে। কিন্তু এরূপ কর্মের পশ্চাতেও মানুষের ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে, নামযশের আকাঙ্ক্ষা থাকে, দম্ভ থাকে। যাঁরা ফল আকাঙ্ক্ষা করে দম্ভের সঙ্গে যজ্ঞ করেন, তাঁদের যজ্ঞ হচ্ছে রাজস যজ্ঞ। পৃথিবীর বহু প্রখ্যাত ব্যক্তি এই রাজস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। মহাকবি মিলটন্ বলেছেন, যশের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে মহৎ মনের শেষ দুর্বলতা। (Fame is the last infirmity of a noble mind.) কিন্তু যাঁরা কর্তব্যবুদ্ধিতে ও নিয়ম অনুসারে যজ্ঞ করেন ও ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দেন,

তাঁদের যজ্ঞ হচ্ছে সাত্ত্বিক (ইম্যানুয়েল ক্যাণ্টের চরিত্রনীতির আদর্শ Duty for the sake of duty তুলনীয়)। স্বেচ্ছাচারী ও শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি যে যজ্ঞ করেন, সে যজ্ঞ হচ্ছে তামসিক। বাস্তবিক, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াকুলচিত্ত, দ্বিধাগ্রস্ত বা অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তিগণ কোন মহৎ কার্য সম্পাদন করতে পারেন না। শ্রীভগবান বলেন, মানুষ যেমন অন্ধভাবে শাস্ত্রবিধির অনুসরণ করবেন না, তেমনই নিজের খেয়ালখুশির বশবর্তী হয়ে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনও করবেন না। শাস্ত্র বলতে বোঝায় অনুশাসনবাক্য, সমাজের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ; সমাজের পরম্পরাগত ঐতিহ্যও (the ethos of a people) এই অনুশাসন-বাক্যের অন্তর্গত। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্ধভাবে শাস্ত্রের অনুসরণ করতে বলেননি। তিনি পুনঃ পুনঃ জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। অর্জুনকে তিনি সকল বিষয়ে বুদ্ধি বা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ।) 'শুধু শাস্ত্র আশ্রয় করে কর্তব্য নির্ণয় করবে না, কেন না, যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি ঘটে', এ যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীরই প্রতিধ্বনি।

'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্য-বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥'

রঘুনন্দন ঃ প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে উদ্ধৃত বৃহস্পতি-বচন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'তপঃ' বা 'তপস্যা' কথাটিও ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। সাধারণতঃ আমরা তপস্যা বলতে বুঝি কৃচ্ছ্রসাধন, দৈহিক ক্লেশকর কর্ম। ধর্মসংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবে এ কথা ঘোষণা করেছেন যে এরূপ ক্লেশকর কর্মের দ্বারা ব্যক্তি বা সমাজের কোনও কল্যাণ হয় না। প্রথমতঃ তিনি তপস্যাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা শারীর তপ, বাঙ্ময় তপ ও মানস তপ। তিনি বলেছেন—দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের (পূজনীয় ব্যক্তিগণের) পূজা, শুচিতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য (ইন্দ্রিয়-সংযম) ও অহিংসাকে শারীর তপ বলা হয়। যে বাক্যে অপরের উদ্বেগ জন্মায় না, যা সত্য, প্রিয় ও হিতকর তাকে বলে বাঙ্ময় তপ। আর একটি বাঙ্ময় তপস্যা হচ্ছে শাস্ত্রপঠনের অভ্যাস। আর মনের প্রসন্নতা, শান্তভাব, মৌন, আত্মসংযম ও বিশুদ্ধ ভাবনা, এগুলি হচ্ছে মানস তপ।

'দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যাসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥'

গী. ১৭।১৪-১৬

সত্য বলতে শ্রীকৃষ্ণ বুঝেছেন লোকহিত বা সর্বভূতের হিত। মহাভারতের কর্ণপর্বে অর্জুনকে ভ্রাতৃবধ থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্মব্যাখ্যা করেছেন, এই প্রসঙ্গে তা স্মরণীয়। মহাভারতের পাঠকমাত্রেই জানেন, শ্রীকৃষ্ণকথিত ধর্মে সত্য ও কল্যাণের আদর্শ অভিন্ন। মনস্বী গিরীন্দ্রশেখর বসু বলেছেন—

'সনাতন ধর্মের নির্দেশ অনুসারে যে বাক্যে পরের উদ্বেগ বা মনঃকষ্ট হয় না এবং যাহা সত্য এবং প্রিয় এবং হিতকর তাহাই সত্য বাক্য নামে অভিহিত। যে সত্য বাক্য অপ্রীতিকর ও অহিতকর তাহা প্রকৃতপক্ষে সত্য নামের যোগ্য নহে।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, এই তিন প্রকার তপস্থাই আবার কর্তার প্রকৃতিভেদে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক হতে পারে। যে তপস্থার মূলে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে, যশ বা প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে মানুষ যে তপস্থায় রত হয়, তা রাজসিক। আর যে তপস্থায় নিজের দেহকে ক্লিষ্ট করা হয়, তা হচ্ছে তামসিক। পরের অনিষ্টসাধনের জন্যে যে তপস্থা, তাও তামসিক।

শ্রীভগবান তিন রকম দানের কথাও বলেছেন—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যে ব্যক্তি কোনও উপকার করেনি অর্থাৎ যার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনও সুযোগ নেই, এরূপ ব্যক্তিকে শুধু কর্তব্য-বুদ্ধিতে যে দান, তাকে বলে সাত্ত্বিক দান। সাত্ত্বিক দানে দেশ, কাল ও পাত্রের বিবেচনা করতে হবে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তেলা মাথায় তেল ঢালার নাম দান নয়। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা দেশ, কাল ও পাত্রের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা হয়ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত নয়। এ যুগের মানুষ গিরীন্দ্রবাবুর ব্যাখ্যার সমর্থন করবেন এবং এ ব্যাখ্যাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত বলে মনে হয়। গিরীন্দ্রবাবু বলছেন—'দারিদ্র্যপীড়িত দেশ, দুর্ভিক্ষাদি কাল এবং কর্মে অসমর্থ জরাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি সামাজিক দৃষ্টিতে দানের উপযুক্ত দেশ, কাল এবং পাত্র সন্দেহ নাই।'

শ্রীভগবান বলেছেন—মানুষ প্রত্যুপকারের আশায় বা অন্য কোন ফললাভের উদ্দেশ্যে (যেমন স্বর্গকামনায়) কষ্টের সঙ্গে যে দান করে, তাকে বলে রাজস-দান। আবার মানুষ অনুচিত দেশে বা কালে অপাত্রগণকে যথোচিত সৎকার না করে অবজ্ঞার সঙ্গে যে দান করে তাকে বলে তামস দান।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান ত্রিবিধ জ্ঞান, ত্রিবিধ কর্ম, ত্রিবিধ কর্তা, ত্রিবিধ বুদ্ধি ও ত্রিবিধ ধৃতির কথা বলেছেন। সমাজদর্শনের দিক থেকে এই সকল পার্থক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ যে কত বড় মনস্তত্ত্ববিদ্ ছিলেন, গীতার শেষ দুটি অধ্যায় পাঠ করলেই তো বোঝা যায়। ত্রিবিধ সুখের প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—যা আরম্ভে বিষের মত কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য, তা হচ্ছে সাত্ত্বিক সুখ। আত্মজ্ঞানের প্রসন্নতা থেকে এই সুখ উৎপন্ন হয়। যা বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে উৎপন্ন, যা প্রথমে অমৃততুল্য ও পরিণামে বিষবৎ, সেই সুখ হচ্ছে রাজস সুখ। আর যা আরম্ভে ও পরিণামে মোহজনক, যা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে উৎপন্ন, তা হচ্ছে তামস সুখ।

শ্রীভগবান অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে পৃথিবীর মানবজাতিকে কর্মযোগের আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন। সংসারে উৎকেন্দ্রিক (অর্থাৎ লক্ষ্যহীন) ও আত্ম-কেন্দ্রিক মানুষের কোন স্থান নেই, এই কর্মভূমিতে প্রত্যেক জাতিকে, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে, প্রত্যেক নরনারীকে প্রকৃতিনির্দিষ্ট বা বিধাতৃনির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করতেই হবে। শুধু পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা নয়, শুধু পরমত-সহিষ্ণুতা বা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নয়, চাই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞের প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন তার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী।

'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।'

গী. ৩।১১

পরস্পর পরস্পরকে পোষণ করে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ কর।

যাঁরা শ্রীভগবানের এই বাণী সর্বদা স্মরণ রাখবেন, তাঁরা কখনও অপরিমিত লোভকে প্রশ্রয় দিতে বা সমাজবিরোধী কার্য সম্পাদন করতে বা অপরকে শোষণ করে নিজেরা ঐশ্বর্যে স্ফীত হয়ে উঠতে পারবেন না। আজ দেশের প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শিল্পপতি ও শ্রমিকগণের ভিতর এই শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক।

'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।'

যে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক, যার লোভক্ষুধানল কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, যে অগণিত মানুষকে বঞ্চিত করে নিজে ধনী হতে চায়, সে চোর, সে পাপী। গীতায় এ কথাটি যজ্ঞের উপমার সাহায্যেই ব্যক্ত হয়েছে।

'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।'

গী. ৩।১৩

গিরীন্দ্রশেখর বসু বলেছেন;—'ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল, ১১৭ সূক্তে ভিক্ষু ঋষি ধনদান-প্রশংসা সম্বন্ধে বলিতেছেন, যিনি অন্নদান করেন, তাঁহার সম্পূর্ণ যজ্ঞফল লাভ হয়। যিনি অপ্রচেতা অর্থাৎ যাঁহার মন উদার নয় তাঁহার ভোজন মিথ্যা এবং মৃত্যুস্বরূপ। যিনি দেবতাকে দেন না, বন্ধুকে দেন না, কেবল নিজে ভোজন করেন, তাঁহার কেবল পাপই ভোজন হয়। 'কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী।'

এই সঙ্গে স্মরণ করি ঈশোপনিষদের কথা, 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্' 'কারো ধনে লোভ কোরো না', আর স্মরণ করি শ্রীমদ্ভাগবতের একটি অমূল্য উপদেশ—

'যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
যোঽধিকমভিমন্যেত সস্তেন দণ্ডমর্হতি ॥'

যে পরিমাণ খাদ্যে উদর পূর্ণ হয়, দেহধারী প্রাণিগণের সেই পরিমাণ খাদ্যেই অধিকার, যে তার চেয়ে বেশী আত্মসাৎ করে, সে চোর, সে দণ্ডের যোগ্য।

তাই বেশী ধন-সঞ্চয় করা নিষিদ্ধ, 'কর্তব্যো নাতিসঞ্চয়ঃ।'

শ্রীভগবান বলেছেন, জীবনের প্রতিটি কর্মকে যজ্ঞে পরিণত করতে হবে। শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বা লোক-কল্যাণের জন্যে যে কর্ম করা যায় তাকেই বলা হয় যজ্ঞ। শ্রীভগবানের আর একটি নির্দেশ হচ্ছে—লোকসংগ্রহের জন্যে অর্থাৎ লোকসকলকে স্ব স্ব ধর্মে প্রবর্তিত করাব জন্যে কর্ম করবে। মানুষ যদি স্বধর্মের অনুসরণ করে, তবেই লোকসংগ্রহের জন্যে কর্ম করা হয়। মানুষের প্রত্যেকটি কর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতির অনুকূল হওয়া চাই, তাকে এমন কর্ম করতে হবে যাতে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ কর্তব্যসাধনে উৎসাহিত হয়। বলপূর্বক অপরকে স্বপক্ষে আনয়নের নাম লোকসংগ্রহ নয়। শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় বলেন—'কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া যাহা করা হয়, তাহাতেই লোকসংগ্রহ,

ইহা ছাড়িয়া যাহা করা হয়, তাহাতে লোকবিগ্রহ। যে ব্যক্তি, যে সমাজ, যে জাতি, যে রাষ্ট্র এই কেন্দ্রে দৃষ্টি রাখিয়া কার্যে অগ্রসর হন, সেই ব্যক্তি, সেই সমাজ, সেই জাতি, সেই রাষ্ট্রই ধন্য।' (কর্মযোগ, পৃঃ ৭২)

এই কেন্দ্র হচ্ছে ধর্ম। আমাদের সকল কর্মই যখন কেন্দ্রাভিমুখী হয়, তখন আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যেও একটা ঐক্য, একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। একেই আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন—Following the Geometrical Method in Life.

এই সংসাররূপ কুরুক্ষেত্রে শ্রীভগবানের বাণী 'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং' ধ্বনিত হচ্ছে, সেই বাণী শিরোধার্য করে আমাদের প্রতিমুহূর্তে অনলস, অতন্দ্রিতভাবে কর্ম করতে হবে। ধর্মের ভিত্তির ওপর আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আমাদের অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, আর ভগবান যীশু মর্ত্যধামে স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীভগবান যে তাঁর ন্যায়দণ্ড আমাদের প্রত্যেকের করে অর্পণ করেছেন, এ কথাও বিস্মৃত হ'লে চলবে না। তাই ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনে আমাদের প্রত্যেককেই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করতে হবে। শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্য শঙ্খের উদাত্ত আহ্বান আমাদের সকল ভয়, সকল দুর্বলতাকে চিরকালের জন্যে দূরীভূত করুক। লাভ ও ক্ষতি, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি, জয় ও পরাজয় কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করে শ্রীভগবানের নির্দেশ আজ শিরোধার্য করে নিতে হবে। আমাদের হৃদ্দেশে অবস্থিত থেকে তিনি আমাদের আহ্বান করছেন—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ'—'ক্লীবতাকে আশ্রয় করো না', 'নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ'—'আত্মাকে অবসন্ন হতে দিও না', 'মামনুস্মর যুধ্য চ'—'আমাকে স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর', আমরা প্রত্যেকে যেন তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অর্জুনের মতই বলতে পারি 'নষ্টো মোহঃ'—'আমার মোহ নষ্ট হয়েছে', 'স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ'—'আমি স্থির ও সন্দেহমুক্ত হয়েছি', তাই 'করিষ্যে বচনং তব'—'তোমার আদেশ আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি'।

জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ

ধর্মের গ্লানি ঃ ধর্মসংস্থাপন

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্ ।।

যিনি কংস ও চাণূর নামক দৈত্যদ্বয়কে নিধন করেছেন, জননী দেবকীর যিনি পরম আনন্দের হেতু, সেই বসুদেবের নন্দন জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

গীতার ধ্যানের এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুর্বৃত্তের চোখে ভয়ঙ্কর ও ভক্তের চোখে রম্য, রুচির। দুর্বৃত্তগণকে বিনাশ না করলে ভূভার-হরণ বা ধর্মরাজ্য-সংস্থাপন হয় না; তাই তিনি দুষ্কৃতের নিধনকারী। দ্বাপর যুগে দুর্বৃত্তগণের নিপীড়নে ও অত্যাচারে উৎপীড়িত শিষ্ট ও সাধুগণের করুণ ক্রন্দন-রোল যখন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছিল, তখন তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের পরিত্রাতা-রূপে। কিন্তু দ্বাপর যুগের শেষভাগে শুধু যে অত্যাচারী রাজন্যবর্গের সীমাহীন দম্ভ ও নির্মম অত্যাচারের ফলেই ধর্মের গ্লানি এসেছিল, তা নয়; তখন ভারতবাসী সনাতন ধর্মের মহান আদর্শ থেকেও ভ্রষ্ট হয়েছিল। তখন শাস্ত্রব্যবসায়ী ক্রিয়াকাণ্ডকুশল বেদবিদ্ পণ্ডিতগণের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হয়েছিল যে, বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করলে কেউ স্বর্গ বা মোক্ষলাভ করতে পারে না; আবার অনেকে মনে করতেন, অনাহারে, অনিদ্রায় বা নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা দেহকে ক্লিষ্ট না করলে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে না; কেউ বা মনে করতেন, কর্মসন্ন্যাস বা কর্মত্যাগই হচ্ছে কৈবল্যলাভের একমাত্র উপায়; কেউ বা মনে করতেন, যাঁরা বৈশ্য বা শূদ্র কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা কখনো পরম গতি লাভ করতে পারেন না, আর যাঁরা নারীকুলে জন্মেছেন, তাঁদেরও ভগবৎ-প্রাপ্তির অধিকার নেই। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করলে আমরা বুঝতে পারি, দ্বাপর যুগের শেষে ভারতবর্ষে অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। তাই, ধর্মের গ্লানি নিবারণের জন্যে, ধর্মসংস্থাপনের জন্যে, দুর্বৃত্তগণকে দণ্ডদানের জন্যে এবং ধর্মের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতবর্ষ গড়ে তোলার জন্যে পুরুষোত্তমের আবির্ভাবের প্রয়োজন ঘটেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, যাগযজ্ঞাদির দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হতে পারে বটে কিন্তু কখনো মোক্ষলাভ হতে পারে না। যজ্ঞের অর্থ যে কত ব্যাপক হতে পারে, শ্রীকৃষ্ণই তা' ভারতবাসীকে তথা জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিলেন। তার কণ্ঠে আমরা শুনতে পেলাম—

'শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।'

গী. ৪।৩৩

হে পরন্তপ, দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহুবিধ যজ্ঞের কথা বলেছেন। তাঁর সমস্ত উক্তির নির্গলিতার্থ এই: আমরা ভগবানের প্রীতির জন্যে কিংবা আত্মশুদ্ধির জন্যে অথবা লোককল্যাণের জন্যে যে কর্ম করি, তাই যজ্ঞে পরিণত হয়। যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে অথবা স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণে অথবা নিখিল বিশ্বের হিতে আত্মনিয়োগ করেন. তাঁরা সকলেই মহাযাজ্ঞিক, তাঁদের কর্ম কখনো বন্ধনের কারণ হতে পারে না। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁরা লোকসংগ্রহের জন্যে যে কর্ম করেন, তা'ও যজ্ঞে পরিণত হয়। এই সকল ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্বদা লোককল্যাণ-যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেন। আবার দেবপূজনও একপ্রকার যজ্ঞ, ইন্দ্রিয়সংযমও যজ্ঞ, দ্রব্যদানও যজ্ঞ, তপস্যাও যজ্ঞ, প্রাণায়ামও যজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রার্থ-চিন্তনও যজ্ঞ, ভগবৎ-প্রীতির জন্যে অনুষ্ঠিত কর্মমাত্রই যজ্ঞ। পশুপক্ষীও কর্ম করে, উদ্ভিদ্‌জগৎও নিষ্ক্রিয় নয়, কিন্তু একমাত্র মানুষই অনাসক্ত ভাবে যোগযুক্ত হয়ে কর্মের অনুষ্ঠান করতে পারে, আর এই কর্মের ভেতর দিয়েই সে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা এই: আদর্শ সমাজে সেই কর্মই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত যার দ্বারা লোককল্যাণ সাধিত হয়, অথবা যার দ্বারা ভগবৎ-প্রীতি সম্পাদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মহাজীবনের দ্বারা এইরূপ কর্মযোগের আদর্শই স্থাপন করেছেন। আমাদিগকে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, ধর্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার জন্যে বা অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যে মানুষ যখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তখন তার সেই সংগ্রামটাও যজ্ঞে পরিণত হয়।

কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা দেহকে ক্লিষ্ট করা যে শ্রেয়োলাভের পথ নয়, সেকথাও পার্থসারথি উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করেছেন। তিনি আমাদিগকে আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সকল বিষয়ে আতিশয্য-বর্জনেরই উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

'অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কাম-রাগ-বলান্বিতাঃ ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥'

গী. ১৭-৫।৬

যারা দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত, কামনা ও রাগের দ্বারা চালিত ও বলান্বিত, দেহস্থিত ইন্দ্রিয়সমূহকে এবং আত্মস্বরূপ আমাকে সেই অবিবেকী পুরুষগণ ক্লেশ প্রদান করে, শাস্ত্রের শাসন লঙ্ঘন করে তারা নিজের ও অপরের পক্ষে পীড়াদায়ক তপস্যার অনুষ্ঠান করে, এইসব কৃচ্ছ্রসাধকদের আসুরবুদ্ধি-বিশিষ্ট বলে জানবে।

কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগের ভেতর কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ সন্ন্যাস কাকে বলে শ্রীভগবান তারও মীমাংসা করেছেন। অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে কর্মসন্ন্যাসের আদর্শ ছিল, তাই অনেকে কর্মত্যাগের ভেতর দিয়েই মুক্তির সন্ধান করেছেন। ব্যষ্টি-মুক্তিকেই যাঁরা জীবনের লক্ষ্য করেছিলেন, সমাজ বা রাষ্ট্রের কল্যাণ সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন উদাসীন। সাংখ্যদর্শনের নির্দেশ হচ্ছে—'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ', অর্থাৎ যদি আজকেই বৈরাগ্যের উদয় হয়, তবে আজকেই সন্ন্যাস অবলম্বন করবে। কিন্তু আমাদের বৈরাগ্যের মূলে যথার্থ বিবেক আছে কিনা, তা আমরা অনেক সময়ে পরীক্ষা করে দেখি না। এইজন্য আমরা শ্মশান-বৈরাগ্য, মর্কট-বৈরাগ্য প্রভৃতিকে যথার্থ বৈরাগ্য বলে ভুল করি। এরূপ বিভ্রান্তির ফলে অথবা সন্ন্যাসের প্রতি মোহবশতঃ ভারতবর্ষে তথা য়ুরোপে বহু অনধিকারী ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। ফলে দেশ ও জাতির পরম অকল্যাণ ঘটেছে। এ সম্পর্কে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাণীকে ভারতবর্ষ যুগে যুগে বিস্মৃত হয়েছে।

অর্জুনের একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥'

গী. ৫।২

কর্মসন্ন্যাস বা কর্মের ত্যাগ এবং কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান, এ দুটোই মুক্তির পথ, কিন্তু কর্মসন্ন্যাসের চাইতে কর্মযোগ উৎকৃষ্টতর।

শঙ্করাচার্য, শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি আচার্যগণ শ্লোকটির ব্যাখ্যায় প্রকারান্তরে কর্ম-সন্ন্যাসেরই প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, শ্রীভগবানের উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে : কর্মযোগী লোক-কল্যাণ বা লোক-সংগ্রহের জন্যে কর্ম করেন, 'বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ' তিনি জীবন ধারণ করেন এবং সর্ব কর্মফল ভগবানে সমর্পণ করেন কিন্তু কর্মসন্ন্যাসী শুধু নিজের মুক্তির জন্যেই প্রয়াস করেন, আর এই জন্যেই কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। যাঁদের লক্ষ্য নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ সন্ন্যাসের সঙ্গে জ্ঞাননিষ্ঠা, তাঁদেরও মনে রাখা উচিত যে, কর্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হলে কারো কর্মত্যাগ বা সন্ন্যাস হতে পারে না। আবার এ সংসারে কর্ম না করে কেউ এক মুহূর্তও থাকতে পারে না, প্রকৃতিজ গুণের প্রভাবেই সকলে কর্ম করতে বাধ্য হয়। যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়-গুলোকে সংযত করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলোকে স্মরণ করে, সে হচ্ছে কপটাচারী! আর সব চেয়ে বড়ো কথা এই যে, ত্যাগের অর্থ কর্মত্যাগ নয়, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা-বর্জন।

[কর্মের অনুষ্ঠান না করলে যে কর্মত্যাগ হতে পারে না, গুরু রামদাস তাঁর দাসবোধে সে শিক্ষা আমাদিগকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

আধী প্রপঞ্চ করাবা নেটকা।
মগ ঘ্যাঁরে পরমার্থ-বিবেকা ॥

প্রথমে সুন্দর রূপে প্রপঞ্চের (জগতের) কার্য করবে, পরে পরমার্থ-বিবেক গ্রহণ করবে]।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কালে অনেক উচ্চবর্ণের লোকের ধারণা ছিল যে, নারী, বৈশ্য ও শূদ্রগণ পরম গতি লাভ করতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীই প্রকৃষ্ট গতি লাভ করতে পারেন। তিনি বলেছেন—'আমাকে আশ্রয় করে নিকৃষ্ট-জন্মা ব্যক্তিগণ এবং স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রগণও পরম গতি লাভ করেন। (গী. ৯।৩২)। অবসাদ বা নৈরাশ্য হচ্ছে ব্যক্তি বা জাতির জীবনে চরম অভিশাপ, আর এই অবসন্নতা হচ্ছে তমোগুণ থেকে উৎপন্ন। শ্রীকৃষ্ণ তাই পৃথিবীর প্রত্যেক নরনারীকে এই অভয়ের বাণী শুনিয়েছেন—'আত্মার দ্বারাই আত্মার উদ্ধারসাধন করবে, আত্মাকে কখনো অবসন্ন হতে দেবে না'। (গী. ৬।৫)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ, অখণ্ড ভারতের প্রতিষ্ঠাতা,

শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী, শ্রেষ্ঠ ধর্মসংস্থাপক, রাজনীতিকুশল, কর্তব্য কর্মে নির্মম অথচ প্রেমময় ; আমরা এই জগদ্‌গুরু কৃষ্ণকে বারংবার প্রণাম করি।

আর প্রণাম করি কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে পাঞ্চজন্য-শঙ্খনিনাদকারী, অর্জুনের তথা বিশ্বের সকল মানবের মোহভঙ্গকারী, দুর্বৃত্তের দলনকারী শ্রীকৃষ্ণকে। এই পার্থসারথিও জগদ্‌গুরু। তাঁর বাণীকে সর্বদা মনন ও অনুধ্যান করেই আমরা ভয়শূন্য ও বীতশোক হব এবং আমাদের মহান আদর্শকে সম্মুখে রেখে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চেষ্টা করব।

ভগবদ্‌গীতার শ্রীকৃষ্ণ মহাসমন্বয়ের আচার্য। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, মনস্বী হীরেন্দ্র নাথ প্রভৃতি বরেণ্য পুরুষগণ এই সমন্বয়বাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একবার তরুণ হীরেন্দ্রনাথ কোনো একটা বিশেষ উপলক্ষ্যে প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্ব' রচনা সমাপ্ত করে গীতার অভিনব ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সে সময়ে জিজ্ঞাসু হীরেন্দ্রনাথ আচার্য বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ভগবদ্‌গীতা-সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন ('নারায়ণ', ১৩২২)—

'ঐ দিন বঙ্কিমবাবুর সহিত গীতার প্রসঙ্গে অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন যে, **তদানীন্তন ভারতীয় সুধীসমাজে কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ নামে যে বিভিন্ন সাধনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, গীতাকার অদ্ভুত প্রতিভাবলে তাহার অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন।** বঙ্কিমবাবুর মুখে এই আমি প্রথম গীতার সমন্বয়বাদের সন্ধান পাইলাম। পরবর্তী কালে আমি ইহার যথেষ্ট সম্প্রসারণ করিয়াছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার আদিম উপদেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র।'

বাস্তবিক, যাঁর ভেতর এই কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সমন্বয় লাভ করেছে, তিনিই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী। এরূপ পরিপূর্ণ মানুষই সংসারে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ করতে পারেন।

শ্রীভগবান অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে আমাদের সকলকে ধর্মযুদ্ধের প্রেরণা দিয়েছেন। শ্রীভগবানের বাণী হচ্ছে—'মামনুস্মর যুধ্য চ।' সঞ্জয়ের মুখে আমরা শুনেছি—যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধনুর্ধর পার্থ আছেন, সেখানেই শ্রী, বিজয়, বৈভব ও অবিচলা নীতি রয়েছে।

ধর্মযুদ্ধ

এই ধর্মযুদ্ধ কাকে বলে, সে সম্পর্কে আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্যে কোনো বলদৃপ্ত স্পর্ধিত ব্যক্তি বা জাতির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, স্বার্থান্বেষী লোভপরায়ণ অর্থগৃধ্নু নরপিশাচগণের সর্বপ্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, কামপরায়ণ ব্যভিচারী ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত নরপশুগণের সর্ববিধ সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, তাকেই বলে ধর্মযুদ্ধ। পরধর্মের বিরুদ্ধে কোনো ধর্মান্ধ ব্যক্তি বা জাতির যে সশস্ত্র অভিযান, অথবা ছলে, বলে কিংবা কৌশলে কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের নরনারীকে ধর্মান্তরিতকরণের যে হীন প্রয়াস, তাকে ধর্মযুদ্ধ বলে না। পৃথিবীতে দুষ্কৃতকারীদের অন্যায় যখন পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, তখন তার বিরুদ্ধে যাঁরা মাথা তুলে দাঁড়ান, তাঁরাই ধর্মযুদ্ধে রত হন। অবশ্য এ কথা সত্য যে, জাতির জীবনে যত অভিশাপ আছে, মহাযুদ্ধ তার মধ্যে চরমতম, আর এই জন্যেই প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বপ্রকারে যুদ্ধ নিবারণ করতে চেষ্টা করবেন। মহাসমরের পরিণাম যে কী ভয়াবহ হতে পারে, যুদ্ধে তথাকথিত বিজয়লাভ যে পরাজয়ের চাইতে বহুগুণে ভয়ঙ্কর হতে পারে, নরশোণিতের প্লাবনে যে ধর্ম ও নীতির সনাতন আদর্শ অন্তত কিছু কালের জন্যে ভেসে যেতে পারে, সে কথা যেমন পার্থসারথি জানতেন, তেমনি অর্জুনও জানতেন। তাই সাম্ববাদী বা শান্তিকামী শ্রীকৃষ্ণ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ নিবারণের জন্যে যথাসাধ্য প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের অপরিমিত লোভ ও অনমনীয় মনোভাব শ্রীকৃষ্ণের 'শান্তির দৌত্য'কে ব্যর্থ করে দিল। তাঁর পুরুষকার ব্যর্থ হ'ল, দৈব বা নিয়তিই এ ক্ষেত্রে প্রবল হয়ে দেখা দিল। কুরুকুল-সভামধ্যে লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর দীর্ঘশ্বাস ব্যর্থ হ'ল না, তাই মহাসমর অনিবার্য হয়ে উঠল। পাণ্ডবদের পক্ষে এই সংগ্রাম হচ্ছে ধর্ম্যসংগ্রাম। তাই মোহগ্রস্ত অর্জুনকে শ্রীভগবান বলেছেন—

'স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥'

গী. ২।৩১

স্বধর্মের দিকে লক্ষ্য করেও তোমার কম্পিত হওয়া উচিত নয়। কারণ, ধর্মযুদ্ধ ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর আর কিছু নাই।

'যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥'

গী. ২।৩২

হে অর্জুন! স্বয়ং (অপ্রার্থিতভাবে) উপস্থিত, উন্মুক্ত স্বর্গদ্বারের মতো এরূপ ধর্মযুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়েরাই লাভ করে থাকেন।

'অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥'

গী. ২।৩৩

আর যদি তুমি এই ধর্মবিহিত যুদ্ধ না কর, তা হ'লে ক্ষাত্রধর্ম ও কীর্তি পরিত্যাগ করে তুমি পাপ প্রাপ্ত হবে।

এই ক্ষাত্রধর্ম কিন্তু আদর্শ পুরুষেরই বৈশিষ্ট্য। যাঁরা অন্যায়, অনাচার, কুসংস্কার, কপটাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, অস্ত্রধারণ করুন আর নাই করুন, তাঁরা সকলেই ধর্মযোদ্ধা। ভগবান তথাগত ও যীশু খ্রীষ্ট, আচার্য শঙ্কর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, গুরু নানক, ভক্ত কবীর, রাজা রামমোহন, সক্রেতিস্; ব্রুণো, স্পিনোজা, মার্টিন লুথার, মার্টিন লুথার কিং, ম্যাট্‌সিনি, গারিবল্ডি প্রভৃতি সকলেই ধর্মযুদ্ধে রত ছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান আমাদিগকে এই ধর্মযুদ্ধে আহ্বান করছেন। বাংলার অন্যতম বিপ্লবী বীর, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) লিখেছেন—

'অসত্য-অধর্ম-অন্যায়-বন্ধনকে অস্বীকার করিয়া তাহার সঙ্গে রফা না করিয়া, তাহাদের ধ্বংস করিয়া, চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সত্য-ধর্ম-ন্যায়-মুক্তি-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মচেষ্টাই বিশ্বদেবতার যে শাশ্বত বিধান, সেই বিধানকে মানিয়া চলিবার আহ্বানই গীতার আহ্বান। অন্যায়ের পীড়নে যে পীড়িত, তাহাকে সর্বাগ্রে অন্যায়ের পীড়ন হইতে মুক্ত হইতে গীতা বলিতেছেন, সেই পীড়ন অসম্ভব করিতে না পারিলে আর কোন কিছু করাই যে তাহার পক্ষে সম্ভব নহে, কোন কিছু করিবার অধিকারও যে তাহার নাই, ইহাই গীতা বলিয়াছেন।' (গীতায় স্বরাজ, উপক্রমণিকা, পৃঃ ৶৹)

কিন্তু এই ধর্মযুদ্ধ করতে হবে নির্লিপ্তভাবে, in the scorn of consequence আর কর্মের ফল সমর্পণ করতে হবে শ্রীভগবানে। তা হ'লে জয়েও তুমি উল্লসিত হবে না, পরাজয়েও তুমি মুহ্যমান হবে না। এটাই হচ্ছে গীতার শিক্ষা।

নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীতে শ্রীকৃষ্ণ মহামানব, 'খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্মরাজ্য-পাশে বেঁধে দেওয়াই' তাঁর জীবনের ব্রত; আর এই জন্যেই পার্থসারথিরূপে তিনি কুরুক্ষেত্রের সমরপ্রাঙ্গণে প্রপন্ন অর্জুনকে মোহপ্রবুদ্ধ করার জন্যে ও পৃথিবীর নরনারীকে শ্রেয়ের পথ নির্দেশ করার জন্যে সর্বোপনিষদের সারভূতা গীতারূপ উপনিষদ্ প্রচার করেছিলেন।

'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মুখে অর্জুনের বিষাদের কথা আমাদের শুনিয়েছেন—

'তুই মহা অনীকিনী; করিয়া দর্শন
স্বজন উভয় সৈন্যে, করুণ হৃদয়ে
কহিলেন পার্থ,—"আমি করিব না রণ"।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কথা শুনে স্বয়ং বিচলিত হলেন। অর্জুন যদি যুদ্ধ না করেন, তবে কৌরবগণের সীমাহীন অন্যায়ের প্রতিবিধান করবে কে? তবে তো পৃথিবীতে পাপের স্রোত প্রবল হবে এবং সত্য ও ধর্মের মর্যাদা ধুলায় লুণ্ঠিত হবে। মোহগ্রস্ত অর্জুনের এই হৃদয়-দৌর্বল্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনে যে ভাবের সঞ্চার হয়েছিল, 'কুরুক্ষেত্রে'র শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে তা ব্যক্ত করেছেন—

'শিহরিনু এ কি কথা! "করিব না রণ"।
আশৈশব নির্যাতন, ঘোর পাপাচার,
সেই জতুগৃহ-দাহ, সেই বনবাস,
সেই কপট দ্যূত-ক্রীড়া, দ্রুপদ-বালার
সেই অপমান লোমহর্ষণ ভীষণ,
পুনঃ ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস হায়!
সর্বশেষ বিনিময়ে সেই সাম্রাজ্যের
সূচ্যগ্রমেদিনী নাহি মিলিল ভিক্ষায়!
থাকে যদি অধর্মের এই অভ্যুত্থান
অক্ষুণ্ণ, হা ধর্ম, তবে কে লইবে নাম।
পার্থ করিবে না রণ! করিবে গ্রহণ
কৌরব-অধর্ম তবে ধর্মের আসন;
কৌরবের এ আদর্শে মানব দুর্বল

করিবে অনন্ত কাল পাপে প্রবর্ত্তিত !
জগতের এ অশান্তি রবে চিরদিন !
অন্তর-বিগ্রহানল জ্বলিবে এমন !
ধর্ম্মের এ দুরবস্থা, দুঃখ মানবের,
নারায়ণ ! পারিব না করিতে মোচন ?
আমার জীবন-ব্রত চলিল ভাসিয়া ;
জীবনের শ্রম মম হইল বিফল ।
সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত দমন,
হইল না ; হইল না ধর্ম্মের স্থাপন ।
পড়িলাম ঘুর্ণাবর্ত্তে ; দেখিলাম হায় !
একদিকে অধর্ম্মের স্বচ্ছ অন্ধকার,
অন্যদিকে ধর্মরাজ্য-জ্যোতিঃ নিরমল,
হইল জীবনে ব্রাহ্মমুহূর্ত সঞ্চার !
... ...
কহিনু অর্জুনে এই ধর্ম সনাতন,
হইয়া সে জ্ঞানাতীতে যোগস্থ বিলীন ।*

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কি রূপক ?

এ কালের যে সকল বরেণ্য মনীষী ভগবদ্গীতার ওপর নতুন আলোকপাত করেছেন, মহাত্মা গান্ধী তাঁদের ভেতর অন্যতম। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামকে রূপক হিসাবে গ্রহণ করাতে এবং গীতার যুদ্ধক্ষেত্রকে দেহীর হৃদয়ক্ষেত্র বলে কল্পনা করাতে তিনি গীতাব্যাখ্যানে বিভ্রান্ত হয়েছেন, তাই তিনি কোথাও কোথাও ভগবানের বাণীর মর্মে প্রবেশ করতে পারেননি।

মহাত্মা গান্ধীর মতে ভগবদ্গীতার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত কর্মযোগ। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে স্বয়ং পুরুষোত্তম মোহগ্রস্ত অর্জুনকে হিংসাত্মক কর্মের প্রেরণা দিয়েছেন, অহিংসার পূজারী গান্ধীজি একথা কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারেননি। তিনি লিখেছেন—

* মনস্বী হীরেন্দ্রনাথের 'গীতায় ঈশ্বরবাদে' (ষষ্ঠ সংস্করণ) উদ্ধৃত।

'একটি বহু পরিচিত রূপকের আশ্রয় কৃষ্ণার্জুন-সংবাদরূপী গীতায় লওয়া হইয়াছে। রথী ও সারথিযুক্ত দেহরথকে ইন্দ্রিয়-অশ্বগণ টানিয়া চলিতেছে। দুষ্ট অশ্বগুলিকে সংযত করিয়া চলিবার কৌশল শুদ্ধ বুদ্ধিরূপে সারথি শ্রীকৃষ্ণ দেহী অর্জুনকে বলিতেছেন। দেহ রথ, রথী অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব ও লাগাম মন। রথ যে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা কুরুক্ষেত্র-রূপ হৃদয়-ক্ষেত্র। দৈবী ও আসুরী—হৃদয়স্থ এই দুই বৃত্তি দুই পক্ষ। সেই যুদ্ধ নিয়তই মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রে চলিতেছে। সেই যুদ্ধে যাহাতে দৈব পক্ষই জয়ী হয়, তজ্জন্য ভগবান সারথি-বেশে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান অজ্ঞ দেহী অর্জুনকে দিতেছেন। (গীতার গান্ধী-ভাষ্য ঃ শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত সংকলিত, পৃঃ ২)

মহাত্মা গান্ধী যে পরিচিত রূপকের কথা বলেছেন, তার বর্ণনা তিনি পেয়েছেন কঠোপনিষদে। কিন্তু ভগবদ্গীতা তো শুধু উপনিষৎ নয়, শুধু ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক গ্রন্থ নয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে বিশ্বের নরনারীকে কর্মের কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির একটা মস্তবড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অধিকারবাদ, আর এই অধিকারবাদের ওপরেই স্বধর্ম ও পরধর্মের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত। মহামানব যীশু খ্রীষ্ট এই অধিকারবাদকে অস্বীকার করতে পারেননি, তাই তিনি বলেছেন—Do not cast pearls before the swine অর্থাৎ উলুবনে মুক্তা ছড়িও না। তথাপি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই অধিকারবাদ ভারতীয় মনীষারই বিশেষ দান, আর এই জন্যেই স্বামী বিবেকানন্দ একে বলেছেন marvellous doctrine. কিন্তু গান্ধীজির দর্শনে এই অধিকারবাদ বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেনি। তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা অনেকটা পরিমাণে বাইবেলের Sermon on the Mount, তুলসীদাস প্রমুখ মধ্যযুগীয় সাধু-সন্ত, সান্ত্ববাদী ও মানবতাবাদী টলস্টয় প্রভৃতির ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তিনি মূল মহাভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভগবদ্গীতার বিচার করেছেন। তাই মহাভারতকার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মধ্যে যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গি তা থেকে স্বতন্ত্র। অবশ্য, এ কথা সত্য যে, গীতা থেকে যে উপদেশ তিনি গ্রহণ করেছেন, তাকে ব্যবহারিক জীবনেও রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সমগ্র মহাভারতের শিক্ষাই যে গীতার সাতশ'

শ্লোকের ভেতর নিবদ্ধ রয়েছে এবং গীতায় যে পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা আদর্শ এক অপূর্ব সমন্বয় লাভ করেছে, মহাত্মাজী তা মেনে নেননি। আমাদের এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, যাঁরা মুক্তিপথের যাত্রী, গীতা যেমন তাঁদের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, তেমনি যাঁরা আদর্শ নাগরিক হতে চান অথবা যাঁরা নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র রচনা করতে চান, গীতা তাঁদের কাছেও অন্ধকার পথে দীপবর্তিকা-স্বরূপ। পৃথিবীর যে কোনো রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যদি গীতার বাণী অনুসরণ করেন, তবে সে রাষ্ট্র হয়ে ওঠে যথার্থ ধর্মরাষ্ট্র, সে রাষ্ট্রে প্রত্যেকেরই ন্যায়সঙ্গত বাক্-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতা ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির ওপর হয় সে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। নররূপধারী নারায়ণের দিব্য কর্ম ও অলৌকিক চরিত্রের আলোকেই আমাদিগকে গীতার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের দিব্য জীবনের পূর্ণ পরিচয় রয়েছে কুরুবৃদ্ধ-পিতামহ ভীষ্ম কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবে,—ভূতলে অতুল্য এই স্তবের ভেতরই রয়েছে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ। গান্ধীজি লিখেছেন—

'গীতার শিক্ষা যদি কেহ হৃদয়ে গ্রহণ করতঃ আচরণে প্রয়োগ করেন, তবে তিনি ব্রহ্মভূত হন। যিনি মানুষের উপরে উঠিয়া পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত হইয়াছেন, যিনি শুভাশুভ পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি সর্বভূতে নির্বৈর হইয়াছেন, তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের নায়ক হইতে পারেন না—ইহা নিশ্চিত।'

গীতার বাণী অনুসরণ করে আমরা বলি, একমাত্র এরূপ লোকোত্তর পুরুষই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের নায়ক হবার উপযুক্ত। যিনি নিষ্কাম বা অনাসক্ত কর্মযোগী, যিনি সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ ও জয়-পরাজয়ে সমদর্শী, যিনি সর্বকর্মফল ভগবানে অর্পণ করতে পারেন, তিনিই কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের নায়ক হবার অধিকারী। ভগবান মনু বলেছেন, বিষয়ে অনাসক্তি ক্ষত্রিয়ের একটি প্রধান গুণ। বাস্তবিক, জনকাদি রাজর্ষি অনাসক্ত কর্মযোগী ছিলেন ব'লেই রাজর্ষি উপাধি লাভ করেছিলেন। এই সব রাজর্ষি জটাধারী হয়ে অগ্নিতে হোম করেননি, রাজধর্ম-পালনের জন্যেই দুর্বৃত্তের দমন ও শিষ্টের পালন করেছেন। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—'জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্মের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছেন'। রাজর্ষি জনকের মুখেও আমরা শুনতে পাই—

'অনন্তং বত মে বিত্তম্ যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহতি কিঞ্চন॥'

'আমার অনন্ত ঐশ্বর্য, কিন্তু আমি অকিঞ্চন, সমগ্র মিথিলা নগরী দগ্ধ হলেও আমার কিছুই দগ্ধ হবে না।'

অন্যত্র গান্ধীজি বলেন, 'ভৌতিক যুদ্ধের সহিত স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না', কিন্তু গীতা আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষও লোক-সংগ্রহের জন্যে অনাসক্ত ভাবে কর্ম করতে পারেন এবং প্রয়োজন হ'লে ধর্ম-সংস্থাপনের জন্যে যুদ্ধেও লিপ্ত হতে পারেন। তাঁর অহংবুদ্ধি থাকে না ব'লেই তিনি হিংসা ও অহিংসা উভয়কে অতিক্রম করেন এবং কোনো পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। গীতার একটি শ্লোকে এই ভাবটি সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েছে।

'যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥'

গী. ১৮।১৭

আমরা দেখেছি, এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় গান্ধীজি বিভ্রান্ত হয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

'এই রকম পুরুষ ত' কেবল এক ভগবান'। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর এই স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যান যে মহাভারতকারের অভিপ্রেত নয়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

গান্ধীজির জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'সত্যমেব জয়তে', সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, আর এই সত্যের যিনি পূজারী, তাঁকে কায়মনোবাক্যে অহিংস ও সংযতেন্দ্রিয় (ব্রহ্মচারী) হতে হবে। যিনি অহিংসা; সত্য ও ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে সাধনা করেন, তিনি যে ধীরে ধীরে দেবজন্ম লাভ করেন, তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের সনাতন ধর্মেও এই সব গুণের ভূয়সী প্রশংসা আছে, কিন্তু ভারতের ঋষিগণ তার চাইতেও বড়ো কথা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, পাপ ও পুণ্য দু'টোই মানুষের জীবনে বন্ধন রচনা করে। তাঁরা পুণ্যকে স্বর্ণ-শৃঙ্খল ও পাপকে লৌহ-শৃঙ্খলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ধর্ম ও অধর্ম, পাপ ও পুণ্য উভয়কে অতিক্রম করা। ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানও অর্জুনকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা ত্রিগুণাতীত হয়ে পাপ ও পুণ্য উভয়কে অতিক্রম করার উপদেশ দিয়েছেন। আবার, একথাও তিনি পুনঃ পুনঃ বলেছেন যে ত্রিগুণ বা প্রকৃতিকে অতিক্রম করার উপায় হচ্ছে নিষ্কাম ভাবে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করা এবং সর্বকর্মফল ভগবানে অর্পণ

করা। অনেকে বলবেন, কোনো শরীরধারী মানুষের পক্ষেই স্থিতপ্রজ্ঞ বা ত্রিগুণাতীত হওয়া সম্ভবপর নয়, this is too abstract an ideal to be carried into practice. কিন্তু ভারতবাসী কখনো তার আদর্শকে খর্ব করে দেখেনি, তার মহাকাব্যে ও পুরাণেও স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। এরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ পাপ ও পুণ্যকে অতিক্রম করেন, তিনি লোককল্যাণের জন্যে ক্রুর কর্ম করলেও অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তা ছাড়া 'আমি হিংসা করি বা হনন করি' আর 'আমি কায়মনোবাক্যে জ্ঞাতসারে কাউকে হিংসা করি না', এই উভয় প্রকার ভাবনার ভেতরেই অহংবুদ্ধি বিজড়িত থাকে, কিন্তু যার অহংবুদ্ধি নাই, তার হিংসাও নাই, অহিংসাও নেই। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্', আবার শ্রীকৃষ্ণ তাকে মোহপ্রবুদ্ধ করলে তিনি বলেছিলেন, 'করিষ্যে বচনং তব'। কিন্তু অর্জুন নিরহঙ্কার হ'লেও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কিন্তু নিরহঙ্কার হতে পারেননি। 'আমি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির',—এই অভিমান সর্বদা তাঁর মনে জাগ্রত ছিল। দ্রোণ-বধের প্রাক্কালে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে পালন করতে পারেননি। আমরা জানি, মিথ্যা কথা বলার জন্যেই যুধিষ্ঠিরকে নরক-দর্শন করতে হয়েছিল। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই: যুধিষ্ঠিরের মধ্যে অহং-বোধ প্রবল ছিল ব'লেই তিনি শ্রীভগবানের শরণাগত হতে পারেননি, তাই তাঁকে নরক-দর্শন করতে হয়েছিল।

সুতরাং গীতার শিক্ষা হিংসাও নয়, অহিংসাও নয়, গীতার শিক্ষা 'কর্মণ্যে-বাধিকারস্তে', গীতার শিক্ষা 'মামেকং শরণং ব্রজ'। ক্ষেত্রবিশেষে অহিংসাও হিংসা হতে পারে, আবার হিংসাও অহিংসা হতে পারে। আবার মহর্ষি বাল্মীকি বলেছেন, অহিংসা হচ্ছে যতিধর্ম, আর দুষ্কৃতকারীর দমন হচ্ছে ক্ষাত্রধর্ম; স্বয়ং মহামানব শ্রীরামচন্দ্রকেও ভূভার-হরণের জন্যে এই ক্ষাত্রধর্ম পালন করতে হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, কায়মনোবাক্যে অহিংস হওয়াটা সন্ন্যাসীর ধর্ম, এটা কখনো গৃহীর ধর্ম হতে পারে না।

অবশ্য, আজকের এই হিংসায় উন্মত্ত ও মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ পৃথিবীতে অহিংসা ও সত্যের আদর্শ প্রচারের একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। যাঁরা যোগী হতে চান, তাঁদেরও অহিংসা ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—'যোগের আটটি অঙ্গ আর এই আটটির ভেতর প্রথম অঙ্গ

হচ্ছে যম। এ যম মৃত্যুরাজ যম নয়, এ যম হচ্ছে—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য), ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। আত্মোপলব্ধি যাঁদের জীবনের লক্ষ্য, তাঁদের পক্ষে এই যম-সাধনার বিশেষ গুরুত্ব আছে। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে অহিংসা বলতে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ অহিংসাকে বোঝায় আর এই অহিংসায় যিনি প্রতিষ্ঠিত হন, কোনো প্রাণীই তাকে হিংসা করতে পারে না। ভগবদ্‌গীতায়ও একাধিক বার অহিংসা কথাটির উল্লেখ আছে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান আত্মজ্ঞানের যে সব সাধনের কথা বলেছেন, তার মধ্যে আছে—

'অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জবম্।'

আত্মশ্লাঘা-শূন্যতা, দম্ভের অভাব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা ইত্যাদি।

অন্যত্র অহিংসাকে শারীর তপস্যা বলা হয়েছে। কিন্তু অহিংসা ও মৈত্রীভাবনা সম্পর্কে ভগবান তথাগত ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ যে ভিন্ন, এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক। বৈরভাবের দ্বারা কখনো বৈরভাব প্রশমিত হয় না, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু এ কথাও তো অস্বীকার করা চলে না যে যাদের লোভক্ষুধানল প্রচণ্ড, যারা দাম্ভিক, মৎসরী বা পররাজ্য-লোলুপ, তাদের কাছে অনেক সময়ে ন্যায়ের দাবী ব্যর্থ হয়। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, ক্রূর কর্ম যেখানে অনিবার্য হয়ে ওঠে, সেখানে ধর্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করবে, কিন্তু কর্তৃত্বাভিমান বিসর্জন দিয়ে, ভগবানের শরণাগত হয়ে দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, তা হ'লেই তোমাকে হিংসাজনিত পাপে লিপ্ত হতে হবে না।

সুতরাং গীতায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ রূপক নয়, আর গীতাকে মূল মহাভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবারও কোনো হেতু নেই। গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রেখেও এ কথা বলা যায় যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে রূপক বলে গ্রহণ করলে মহাকবির ধ্যান-ধারণাকে অস্বীকার করতে হয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে, প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগেও কোনো কোনো ভাষ্যকার বা নিবন্ধকার গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন অভিনব গুপ্ত। কিন্তু এই সব মনীষী সাধনার রাজ্যে অগ্রসর হলেও শ্রীকৃষ্ণের বাণীর তাৎপর্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি।

আরও দু'একটি কথাও আমাদের প্রণিধানযোগ্য। মহাত্মা গান্ধীর নিকট

সত্য ও truth সমার্থক শব্দ, কিন্তু মহাকবির দৃষ্টিতে সত্যের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। মহাভারতে বলা হয়েছে—

'সত্যস্থ বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদপি হিতং বদেৎ।
যদ্‌ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং মতং মম' ॥

শান্তিপর্ব, ৩১৮।১৩

'সত্য কথনই শ্রেষ্ঠ, সত্যের চেয়েও পরের হিতবাক্য বলবে যা প্রাণীদের পক্ষে পরম হিতজনক, তাই হচ্ছে সত্য, এই আমার মত।

আবার গান্ধীজি বলেছেন, 'ভৌতিক যুদ্ধের সহিত স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না', কিন্তু মহাভারতের শান্তিপর্বে নারদ শুকদেবকে বলেছেন—

'জ্ঞানেন বিবিধান্ ক্লেশানতিবৃত্তস্থ মোহজান্।
লোকে বুদ্ধিপ্রকাশেন লোকমার্গো ন রিষ্যতে' ॥

শান্তিপর্ব, ৩১৮।৫২

যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানের ফলে মোহসঞ্জাত বিবিধ ক্লেশ অতিক্রম করতে পারেন, জগতে সর্ব ব্যাপারে তাঁর বুদ্ধি প্রকাশিত হওয়ায় লৌকিক ব্যাপারও নষ্ট হয় না। সুতরাং এরূপ ব্যক্তি ধর্ম-সংস্থাপনের জন্যে সংগ্রামে রত হতে পারেন। মুক্ত বা তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরাও লোক-সংগ্রহের জন্যে প্রয়োজন-বোধে মৃদু বা দারুণ কর্মে লিপ্ত হতে পারেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ

পাশ্চাত্ত্য সমাজদর্শনে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। যাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, তাঁরা বলেছেন, ব্যক্তির জন্যই সমাজ, সমাজের জন্য ব্যক্তি নয়। প্রত্যেকটি ব্যক্তির যাতে দেহ, মন ও আত্মার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটে, প্রতিটি মানুষ যাতে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে পরিস্ফুট করে তুলতে পারে, তার জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করাই সমাজের কর্তব্য। ব্যষ্টির কল্যাণেই সমষ্টির কল্যাণ, আর সমাজ হচ্ছে জনসমষ্টিমাত্র (a collection of individuals)। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন যে, সমাজের জন্যেই ব্যক্তি, সমাজের কল্যাণেই ব্যক্তির কল্যাণ, সমাজের বাইরে ব্যক্তির কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। তৃতীয় এক শ্রেণীর দার্শনিক মনে করেন যে, ব্যক্তির জন্যে সমাজ এ কথা যেমন সত্য, সমাজের জন্যে ব্যক্তি, এ কথাও তেমনি সত্য।

এই জন্যে প্রত্যেকটি শিশুকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তার ভেতরে সমাজ-চেতনা জাগ্রত হয়, অথচ তার ভেতর স্বাধীন চিন্তারও উন্মেষ হতে পারে। এই জন্যেই প্রতীচ্য দেশের কোনো কোনো দার্শনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয়-সাধনের পক্ষপাতী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এই সমন্বয়ের আদর্শই স্থাপন করেছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল কথা হচ্ছে, মানুষে মানুষে নৈসর্গিক বৈষম্যকে অর্থাৎ মানুষের রুচি-প্রকৃতির পার্থক্যকে স্বীকার করা। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে প্রত্যেক মানুষের ভেতর সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটি গুণ বর্তমান, আর আত্মরক্ষা, সমাজরক্ষা ও রাষ্ট্ররক্ষার জন্যে এই তিন গুণেরই প্রয়োজন আছে। তবু এ কথাও সত্য যে, কারো ভেতর রজোগুণ, আবার কারো ভেতর বা তমোগুণ প্রবল। মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে চাইলেও প্রকৃতিজ গুণই তাকে কর্ম করায় আর এই কর্মই হচ্ছে তার স্বধর্ম। কোনো মানুষেরই কোনো অবস্থায় স্বধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য হয়ত পূর্ণতা লাভ করা, স্থিতপ্রজ্ঞ বা গুণাতীত হওয়া। কিন্তু এ লক্ষ্যে পৌছতে হলে চাই জন্মজন্মান্তরের সাধনা। সামাজিক মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, প্রকৃতির অনুবর্তন করেও ধীরে ধীরে প্রকৃতিকে অতিক্রম করা। সত্ত্বগুণের ফল সুখ, রজোগুণের ফল দুঃখ আর তমোগুণের ফলে মোহ উৎপন্ন হয়। যারা রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির মানুষ, তারা প্রকৃতিনির্দিষ্ট কর্ম করেও প্রকৃতিকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করবেন। এটাই হচ্ছে কর্মের কৌশল। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন— দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কামনা রজোগুণ থেকে উৎপন্ন, আর এই কামনা যখন প্রতিহত হয়, তখনই ইহা ক্রোধরূপে পরিণত হয়। এই কামনা ও ক্রোধই হচ্ছে মানুষের মহাশত্রু। মহাভারতের শান্তিপর্বেও বলা হয়েছে—

'সর্বোপায়াত্তু কামস্য ক্রোধস্য চ বিনিগ্রহঃ।
কার্যঃ শ্রেয়োঽর্থিনা তৌ হি শ্রেয়োঘাতার্থমুদ্যতৌ॥'

শান্তিপর্ব, ৩১৮।১০

মঙ্গলকামী মানুষ সমস্ত উপায়ে কাম ও ক্রোধকে দমন করবেন। কারণ, কাম ও ক্রোধ সর্বদাই মঙ্গলকে নষ্ট করার জন্যে উদ্যত থাকে।

যিনি কাম ও ক্রোধকে জয় করেছেন, তিনি ষড়রিপুর ওপরেই বিজয়ী হয়েছেন। মানুষে মানুষে গুণগত বা প্রকৃতিগত এবং রুচিগত ভেদ আছে,

এইজন্যে একজনের পক্ষে যেটা কর্তব্য, আর একজনের পক্ষে সেটা অকর্তব্য হতে পারে, বিভিন্ন মানুষের পক্ষে সাধনার পদ্ধতিও বিভিন্ন হতে পারে, তথাপি, সকল মানুষেরই জীবনের লক্ষ্য—পূর্ণতা-লাভ, আর এই পূর্ণতা-লাভের উপায় হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সংযম। ইন্দ্রিয়-নিরোধের পথ কিন্তু সকল সময়ে কল্যাণের পথ নয়। (এখানে Repression অর্থে ইন্দ্রিয়-নিরোধ কথাটির প্রয়োগ হয়েছে।) মানুষে মানুষে গুণগত পার্থক্য তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্র ঘোষণা করেছেন, জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীরই মুক্তিলাভের অধিকার আছে, কিন্তু সকলের সাধনপদ্ধতি বা আচার একরূপ হ'লে চলবে না। যারা তমোগুণী, তন্ত্র তাদের জন্যে পশ্বাচারের বিধান দিয়েছেন, কিন্তু রজোগুণী লোকের জন্যে বীরাচারই প্রশস্ত। আবার যারা সত্ত্বগুণী, তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত দিব্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তি-মহিমাকে স্বীকৃতি দান করেছেন, তেমনি মানুষের প্রতিটি কর্মের লক্ষ্য যে লোকহিত বা সমাজের কল্যাণসাধন (লোক-সংগ্রহ), সে কথাও বারংবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি ছিলেন একাধারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী, তিনি এমন একটি শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন, যে সমাজে আত্ম-কেন্দ্রিক সমাজচেতনা-বিহীন মানুষেরা পাপাচার তস্কর বলে গণ্য হবে,* যে সমাজে সকল স্তরের লোকদের ভেতর থাকবে সহযোগিতা ও প্রীতির সম্পর্ক,† যে সমাজে প্রতিটি মানুষ হবে পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান অথচ স্বধর্ম-পালনে তৎপর, যে সমাজে সমাজবিরোধী দুর্বৃত্ত লোকমাত্রেই দণ্ডভোগ করবে এবং শিষ্টজনেরা ভগবৎ-প্রীতি ও লোককল্যাণের জন্যে শাস্ত্রবিহিত ও সাধুজন-সম্মত কর্মের অনুষ্ঠান করবেন। ভগবান যীশু যেমন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তেমনি নিখিল বিশ্বে এক অখণ্ড ধর্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। (ব্যাসদেব-রচিত মহাভারত

* তৈর্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।
গী. ৩।১২

ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।
গী. ৩।১৩

† পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।
গী. ৩।১১

যাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করেছেন, তাঁদের নিকট এ কথা প্রমাণ করার আবশ্যকতা নাই)।

ভারতীয় ঋষির নির্দেশ হচ্ছে 'অন্নং বহু কুর্বীত', বহুলরূপে অন্ন বা খাদ্য-শস্য উৎপাদন করবে। কিন্তু সে অন্ন শুধু নিজের ভোগের জন্যে নয়, সে অন্ন 'বহুজনসুখায়', বহুজনের সুখের জন্যে। এ দেশের স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ গৃহস্থের জন্যে পঞ্চ যজ্ঞের বিধান দিয়েছেন। এ দেশে ধনীর ধন কোথাও কেন্দ্রীভূত না হয়ে বহুজনের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে, তাই ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য কখনো মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয়নি। এদেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ স্থাপন করেছেন, তা হচ্ছে ভারতীয় ঋষিগণের অনুমোদিত ধর্মভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদ, কিন্তু এ ধর্ম কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। যে ধর্ম যুগে যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধারণ করেছে, এ হচ্ছে সেই ধর্ম।

দৈবী ও আসুরী সভ্যতা

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৈবী ও আসুরী সম্পদের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। আমরা যাকে সভ্যতা বলি, তাকেও দৈবী ও আসুরী এই দুই ভাগে ভাগ করা চলে। রামায়ণে দেখি অযোধ্যা ও মিথিলার সভ্যতা ছিল দৈবী সভ্যতা, আর 'স্বর্ণসৌধ-কিরীটিনী বৈদূর্য্যময়-তোরণা' লঙ্কার সভ্যতা ছিল আসুরী সভ্যতা। আসুরী সভ্যতায় আমরা পাই উপকরণের বাহুল্য, বাহ্য সম্পদের প্রাচুর্য; এই সভ্যতার বিকাশের মূলে থাকে মানুষের অপরিমিত ভোগাকাঙ্ক্ষা। দৈবী সভ্যতা ধর্মের ওপর আর আসুরী সভ্যতা অধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যে সভ্যতাভিমানী অসুরপ্রকৃতির লোকেরা কখনো চরম তৃপ্তি বা পরা শান্তি লাভ করতে পারে না। তারা দর্প, অহঙ্কার ও অবিবেকের দ্বারা চালিত হয়, কাম, ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হয় ও অন্যায়পূর্বক অর্থ সঞ্চয় করে—এই সব ক্রূরকর্মা লোকের নিকট শৌচ, সদাচার ও সত্যের কোনো মূল্য নাই, ভোগই হচ্ছে এদের জীবনের পরম পুরুষার্থ। এরা কর্মফলদাতা ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করে না। পরস্বাপহরণে বা পররাজ্যগ্রাসে এরা কুণ্ঠিত হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে এই ইঙ্গিত করেছেন যে আসুরী সম্পদ শুধু মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে তোলে, আসুরী সভ্যতা কখনো পরিণামে জয়যুক্ত

হতে পারে না, কারণ, 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ', 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারতের ভেতর দিয়ে এই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছেন যে—

'অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি'॥

অধর্মের দ্বারাই মানুষ প্রথমে বৃদ্ধিলাভ করে ও জাগতিক মঙ্গলকে দেখতে পায়, অধর্মের দ্বারাই মানুষ শত্রুর ওপর বিজয়ী হয়, কিন্তু পরিশেষে অধর্মকে আশ্রয় করার ফলেই সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

পাশ্চাত্ত্যের ভোগবাদী সভ্যতাও আসুরী সভ্যতা, তাই সভ্যতা-বিস্তারের নামে বলদৃপ্ত পাশ্চাত্ত্য জাতিগণ তথাকথিত বর্বর-অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহকে বারংবার নরশোণিতে কলঙ্কিত করেছে। স্বামিজী একদিন প্রতীচ্যের গর্বিত জাতিসমূহের উদ্দেশ্যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, 'পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এক আগ্নেয়গিরির ওপর প্রতিষ্ঠিত'।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পিত আদর্শ সমাজে প্রতিটি মানুষ দৈবী সম্পদ অর্জনের জন্যে সাধনা করবেন। এ সমাজে ধন-সম্পদ বা কুলের আভিজাত্য থাকবে না, এ সমাজে শুধু চারিত্রিক আভিজাত্যই (aristocracy of character) স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পিত আদর্শ সমাজ বা দেবমানব-সমাজ গঠন করতে হলে আমাদিগকে শাস্ত্রবিহিত বা সাধুজনের অনুমোদিত কর্ম করতে হবে, বিকর্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ বা লোক-বিগর্হিত কর্ম বর্জন করতে হবে আর কি ভাবে কর্মকে অকর্মে পরিণত করা যায়, সে কৌশলও আয়ত্ত করতে হবে।

'কর্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ॥'
গী. ৪।১৭

[আচার্য্য বিনোবা ভাবে 'বিকর্মের' অর্থ করেছেন 'বিশিষ্ট কর্ম'। তিনি এই শ্লোকটি ও পরবর্তী শ্লোকটির ওপর নতুন আলোকপাত করেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যান মহাভারতকারের অভিপ্রেত নয়।]

শ্রীকৃষ্ণ-পরিকল্পিত আদর্শ সমাজ রচনা করতে হলে আমাদিগকে আরও দু'টি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমতঃ সমাজে যাঁরা অভিজাত

বা উচ্চপদস্থ. তাঁদের ধর্মের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হলে চলবে না, দ্বিতীয়তঃ নারী-সমাজে যাতে কোনো অনাচার বা ব্যভিচার প্রশ্রয় না পায়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। আদর্শ সমাজে প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি কর্মের লক্ষ্য হবে লোককল্যাণ বা অধিকতম লোকের প্রভূততম মঙ্গল। (the greatest good of the greatest number).

স্বাস্থ্যনীতি ও মনস্তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পিত সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি ব্যক্তি হবে আধি-ব্যাধি থেকে মুক্ত—যারা বলবান, বীর্যবান ও ইন্দ্রিয়জয়ী, তারাই এই সমাজ ও রাষ্ট্রে মর্যাদা লাভ করবে। তাই আমরা দেখতে পাই, মানুষ কি ভাবে সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের অধিকারী হতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ তারও নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ-কথিত স্বাস্থ্য-নীতি হচ্ছেঃ ১. অতি-ভোজন বর্জন করবে। ২. একান্ত অনাহারেও কাল যাপন করবে না। ৩. অতি নিদ্রা পরিহার করবে। ৪. অতি জাগরণশীল হবে না। ৫. নিয়মিত কালে ও নিয়মিত পরিমাণে আহার করবে ও নিদ্রা যাবে। যারা এই সব নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাদের চিত্ত স্থির হয় না, তারা দেহ ও মনে রুগ্ন হয়ে পড়ে। (দ্রঃ গীতা, ৬।১৬-১৭) ৬. যে খাদ্য, আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্ধিত করে, সেই খাদ্যই গ্রহণ করবে। ৭. রাজসিক ও তামসিক আহার বর্জন করবে। (দ্রঃ গীতা, ১৭।৮।৯) ৮. দেহস্থিত ইন্দ্রিয়সমূহকে তপস্যার দ্বারা ক্লিষ্ট করবে না (ঐ, ১৭।৬)।

ভগবদ্গীতায় যেমন স্বাস্থ্য-নীতি রয়েছে, তেমনি আছে চরিত্রনীতি ও মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি মূলসূত্র। স্বধর্ম, পরধর্ম, গুণত্রয়বিভাগ, শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ, প্রভৃতি বিষয়গুলি মনোবিজ্ঞানীর নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গীতায় 'যোগ' শব্দটিও নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। গীতায় ভগবান বলেছেন—ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করলেই বিষয়ের প্রতি আসক্তি দূর হয় না (২।৫৯), বিষয়ের চিন্তা করতে করতে বিষয়ের প্রতি আসক্তি জন্মে, আসক্তি থেকে কামনার জন্ম হয়, কামনা বাধাপ্রাপ্ত হলেই ক্রোধে পরিণত হয়, ক্রোধ থেকে জন্মে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে উৎপন্ন হয় স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ থেকে হয় বুদ্ধিনাশ আর বুদ্ধিনাশ হতে হয় সর্বনাশ' (২।৬২-৬৩)। তিনি আরও বলেছেন, যিনি কাম ও ক্রোধের বেগ

ধারণ করতে পারেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই সুখী (৫।২৩)। এ রকমের ভূরি ভূরি উক্তি গীতায় রয়েছে যা মনোবিজ্ঞানীর নিকট বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মনকে জয় করার কৌশলও পার্থসারথি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই গীতার বাণী অনুসরণ করে আমরা পরিপূর্ণ দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারি।

উপসংহার

আজ আমাদের জাতীয় জীবনে পুঞ্জীভূত নৈরাশ্য ও অবসাদের মধ্যে প্রমত্ততা ও লক্ষ্যভ্রংশের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্যের উদাত্ত আহ্বান আমাদের কর্ণে প্রবেশ করুক। আমরা যখন জড়তা, উদ্যমহীনতা বা ক্লৈব্যকে আশ্রয় করি, তখন যেন অন্তরের মধ্যে পার্থসারথির বাণী শুনতে পাই, 'ক্লৈব্য মাস্ম গমঃ'—যখন অবসাদের মেঘ আমাদের হৃদয়-গগনকে অধিকার করে, তখন যেন তাঁর বাণী 'নাত্মানমবসাদয়েৎ' শ্রবণ করে বীরের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি, যখন আমরা কঠোর জীবন-সংগ্রামে ভঙ্গ দিয়ে কপট বৈরাগ্যকে আশ্রয় করি; তখন অন্তরের মধ্যে যেন শুনতে পাই পাঞ্চজন্যের অমোঘ অহ্বান 'মামনুস্মর যুধ্য চ', সত্য, ধর্ম ও কল্যাণের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট, জাতীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, ইহকাল-সর্ব্বস্ব ও আত্মকেন্দ্রিক ভারতবাসী যদি আজো তাঁর আহ্বানে কর্ণপাত না করে, তবে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদের বলতে হবে—

'তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব
আঘাত খেয়ে অচল রব
বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ।'

—বলাকা

পার্থসারথির বাণী আমরা যতই জীবনে রূপায়িত করার চেষ্টা করব, ততই আমরা সর্বপ্রকার শোক ও ভয়, দুঃখ ও দৈন্য অতিক্রম করতে পারব। তখন আমাদের প্রতিটি কর্ম হবে ঈশ্বরের উপাসনা, প্রতিটি কর্ম হবে লোক-কল্যাণের অভিমুখ। স্বধর্ম-পালনে আমরা মুহূর্তের জন্যেও উদাসীন হ'ব না, সর্বপ্রকার অত্যাচার, অনাচার, অবিচার, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে আমরা হ'ব দুর্জয় সংগ্রামে রত, শাস্ত্র ও যুক্তি হবে আমাদের পথ-প্রদর্শক, শ্রদ্ধা হবে আমাদের চলার পথের পাথেয়। স্বদেশী যুগে যেমন একদল তরুণ ভগবানের পাঞ্চজন্যের আহ্বান শুনে সববিধ ভয়কে জয় করেছিল, আজ সারা ভারত তেমনি একদল মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণের আবির্ভাব প্রতীক্ষা করছে যাঁদের ভেতর ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রবীর্যের এক মহাসমন্বয় ঘটবে (অগ্রতশ্চত্বারো বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ সশরং [illegible])। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন, ভারতের ঘরে ঘরে পার্থসারথির পু[illegible], এই তমসাচ্ছন্ন দেশের অধিবাসীগণ প্রবল রজোগুণের উন্মাদনায় কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ুক বাস্তবিক এই পার্থসারথির নির্দেশ শুনে যেদিন আমরা প্রত্যেকে বলতে পারব—'করিষ্যে বচনং তব', 'তোমার উপদেশ আমি পালন করব, সেদিনই আমরা যথার্থ স্বদেশের কল্যাণ-ব্রতে দীক্ষিত হতে পারব।' উপসংহারে আমরা সকলে মিলিত হয়ে পার্থসারথির উদ্দেশ্যে আমাদের প্রণাম জানাই—

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥'